বিবিধ প্রবন্ধ

ড. প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ সেঁজুতি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ
+৯৮৩৬৭৬৭৫৪৫
dhansere2012@gmail.com

ISBN : 978-93-93703-06-4

ধানসিড়ি-র পক্ষ থেকে
শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫০ থেকে প্রকাশিত ও
ইম্প্রিন্টা ২৪৩/২বি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র
রোড কলকাতা ৭০০০০৬
থেকে মুদ্রিত

দাম ২৫০ টাকা $ 15

প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের চরণকমলে

ভূমিকা

আলোচ্য বহুস্বাদে সমায়িত বইটা 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত হল। যাহোক বইয়ের নামকরণ নানাভাবে হয়। সাহিত্য বাস্তবের প্রতিফলন হলেও মনের দর্পণের এলোমেলো বিম্ব বা সজ্জিত প্রতিফলনও হওয়া সম্ভব। প্রবন্ধ মানে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধ। কঠিন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ কখনও কষায় স্বাদ আনে কি? অতি লঘু বিষয় পাঠরসকে অতীব তরলতায় পর্যবসিত করে। যাহোক এই লেখকের এটি অষ্টম বাংলা প্রবন্ধের বই। ফরাসি ভাষায় যাকে 'বেলে লেতর' (Belles-Letters) বলে। বাংলায় তাই অনেকটা লঘুগুরু প্রবন্ধ। আলোচ্য বইয়ে প্রবন্ধ পাঠকের স্বাদ বদলের প্রয়াস হয়তো আছে। আশা করি পাঠক তার রুচিমতো খুঁজে নেবে। শেকসপিয়রের কথায়—'Alls well that ends well', বাংলায় যা—'সব ভালো যার শেষ ভালো।' বইয়ের ভবিষ্যৎ পাঠকের পাঠে। আর কি? বইয়ের শতচেষ্টায়ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের নিজগুণে মার্জনা প্রার্থনা করি। এই বই বিভিন্ন সময়ের নানাবিধ তাগিদ চাহিদার ফসল। লেখকের সব ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নির্ধারিত নয়। এই বই রচনায় বাড়ির একমাত্র সদস্যা ভগিনী শ্যামশ্রীর ভূমিকা কম নয়। সে আমার সব লেখার প্রথম পাঠক ও সমালোচক। এ ছাড়াও কোনোভাবে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার শিক্ষার্থীদের। ধন্যবাদ জানাই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ জনশিক্ষা মন্দির গ্রন্থাগার কর্মীদের। অলমিতি বিস্তরেণ।

প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত
শুভ বড়োদিন, ২০২২

সূচিপত্র

দাম্পত্যের প্রেমের আলোয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল সাংগীতিক প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। সেকালের কৃষ্ণনগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'...দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ ও সংগীত বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালা হিন্দী দুভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধহয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।' (আত্মকথা—প্রমথ চৌধুরী)।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা তাঁর পড়াশোনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। ১২ বছর বয়স থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখতেন। ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করার পর কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে 'বিলাত প্রবাসী' নাম দিয়ে পতাকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। (দ্বিজেন্দ্র ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র ও হরেন্দ্রলাল রায় সাপ্তাহিক পতাকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে 'বিলাত প্রবাসী' প্রকাশিত হয়।) তিন বছর পর বিলেত থেকে ফিরে দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি কার্যভার গ্রহণ করেন। বিলেত যাওয়া তখনকার রক্ষণশীল সমাজে যথেষ্ট বিড়ম্বনার ব্যাপার ছিল। এমনকি তা ঘোরতর অশাস্ত্রীয় বলেও গণ্য হত। সামাজিক উৎপীড়নের জ্বালায় তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এবং তারই ফল 'একঘরে' নকশায় প্রকাশিত হয়েছিল। নকশাটির ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও সাহিত্যিক মূল্য প্রায় কিছুই নেই।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠকন্যা সুরবালাদেবীর বিয়ে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের ওপর তাঁর স্ত্রীর প্রভাব অনন্য। সুরবালাদেবী প্রত্যক্ষ ও

অপ্রত্যক্ষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। অনেকের মতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোলোকে দুটি ধারা প্রবহমান : আত্মমুগ্ধ প্রেমবিহ্বল স্বপ্নাতুর কবি ও অসংগতি ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। এই দুটি ধারা কখন স্বতন্ত্র ধারায় সমাজরেখায় প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনও-বা এই দুই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও সামাজিক নির্যাতন—দুয়ের কেন্দ্রেই পত্নী সুরবালাদেবী। 'সাজাহান' নাটকে দিলদারের কণ্ঠে যে-গান—

আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান
আজি আমার যা কিছু আছে
এনেছি তোমার কাছে তোমারে করিতে সব দান।

অথবা দ্বিজেন্দ্রের আর-একটি উল্লেখযোগ্য হাসির গান—

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয়,
কার কি জানি কখন সন্ধে হয়।
ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝরে যাবে হায়;

এ যেন তাঁর দাম্পত্য প্রেমেরই মধুর ছায়া—

মনের বাসনা বুঝি বা রয়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বুঝি বেলাটি বয়ে যায়।
আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর তানে,
'আসে নি আসে নি সে'—এ বারতা কয়ে যায়,

আবার, বৈষ্ণব পদাবলির অনুকরণে দ্বিজেন্দ্র-গানে ধ্বনিত হয়—

ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসি মধুর সম্ভাষি যমুনার বাঁশি বাজে;
ঐ কানন উছলি 'রাধে রাধে' বলি—যায় চলি বনমাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায় হাসি;
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জ্যোছনারাশি।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে প্রথমে সুর দিয়ে পরে কথা বসাতেন এবং হিন্দুস্থানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর মূলত ব্যবহার করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে অনেক সময় আটপৌরে কথা, উপমাও ব্যবহৃত, অথচ গীতধ্বনি অত্যন্ত প্রাণময়। যেমন—

কেন আর ভাঙ্গাঘরে মারিস তোরা সিঁধকাটি?
ছিন্ন তরুণ মূল হতে কেন তুলে দিস মাটি?
বিষে জর জর প্রাণে, কেন হানিস বিষবাণে?
পাপের বন্যাভরা দেশে, আনিস নরক খাল কাটি?

আবার, হাসির গানে ব্যঙ্গের খোঁচা বা তির্যক শ্লেষের পরশ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত

গান দুটিতে—

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে?

আবার,

কেন খুঁজতে যাস রে বিমল প্রেমে,—এ জগতে ভাই।
কেন মিছা খুঁজা, পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।

কখনো-কখনো বিস্ময়ঘোর ও হাসির গানে অন্য মাত্রা এনেছে। যেমন—

মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভালবাসিবে।

আবার অন্য এক গানে তিনি লেখেন এমন বাণীরূপ—

কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা,
কেমন মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয় ধারা?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেন লো চুমিতে চাঁদে?
যখন অযুত তারা শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।

কখনও-বা হালকা হাস্যকৌতুক ও একক বা কোরাস গানে রঙ্গিবিরঙ্গী এনেছে—

খাও খাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবিরে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে।
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক না কেটে;
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে?

রঙের ছোঁয়াচেই লেখা হয়—

আমরা খাসা আছি—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

কখনও-বা এমনও লেখেন—

দুরে থেকে দেখতে ভালো, দেখ নয়ন মেলে,
পস্তাবে গো আরো বেশি কাছে ঘেঁষে এলে।

হাসির গান হিসেবে উল্লেখযোগ্য—

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন ভাই
আর তানসেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায়

'সামাজিক' নামে হাসির গানে ব্যঙ্গের ছোঁয়া যথেষ্ট দাগ কাটে—

যদি জানতে চাও আমরা কে,

আমরা Reforemed Hindoos

আমাদের চেনে না ক যে,

Surely he is an awful goose.

অন্যদিকে কবি নিজের বিলেতযাত্রাকে স্মরণ রেখেই কৌতুকের আবরণে লেখেন—

আমরা বিলাত ফের্ত্তা ক ভাই।

আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;

তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার

করিয়াছি সব জবাই।

ইঙ্গ-বঙ্গ মিশ্র অনুকরণের চেহারাকে ব্যঙ্গের গানে ফুটিয়ে তোলেন—

হল কি! এ হল কি!—এ ত ভারি আশ্চর্য্যি।

বিলেত-ফের্ত্তা টান্‌ছে হুকা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চর্য্যি।

হোটেলফের্ত্তা মুন্সেফ ডাকছেন 'মধুসূদন কংসারি!'

চট্ চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী!

বিলেতি প্রথার অনুকরণে নারীশিক্ষার মূল দিক ছাড়াও বিলেতি আদব কায়দার অনুকরণকে ঠুকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত একসময় ব্যঙ্গের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কতকটা সেই কায়দায় লিখেছেন—

কটি নবকুল-কামিনী।

অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।

জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে;

চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে;—

পারত পক্ষে উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে।

গৃহের কার্য্য করুক সকলে-খুড়ি, জ্যেঠী, পিসী, মাসীতে;

আমরা সবাই, নব্য প্রথায়, শিখেছি হাসিতে কাশিতে;

ধার্মিক ও নাস্তিকের রূপভেদ নীচের গানটি—

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,

খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত—

বিশ্বাস হল খ্রীষ্টধর্ম্মে ভজতে পাচ্ছি খ্রীষ্টে,—

এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে!

ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—

(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

'নন্দলাল' দ্বিজেন্দ্রলালের আর-এক বিখ্যাত হাসির গান—

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—

স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।

সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি কর কি নন্দলাল?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!

প্রেম বিষয়ক দ্বিজেন্দ্র-গানে তাঁর দাম্পত্য প্রেমেরই প্রতিরূপ দেখতে পাই—

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না future এর চিন্তা, থাকে না ক shame,—
তারেই বলে প্রেম।

যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ;
যখন past all surgery আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame;—
তারেই বলে প্রেম।

ইংরেজি ও বাংলা শব্দ মিশিয়ে তখনকার এক রীতিতে এই গানগুলি রচিত। এই গানের পালতোলা নৌকায় ভেসে চলেছে কবি ও সুরবালার প্রেম। তারপরেই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

প্রথম যখন বিয়ে হল, ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলবো তাহা কাহারে!
ভাবলাম বাহা বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু। শুঁকবো শুধু গন্ধটুক;
রাখবো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে কর্‌বো না তায়,
রাখবো তারে মাথায় মাথায়, খুঁজবো না ক আঁখির পাতায়;—
হারাই পাছে তাহারে।

ভাবলাম বাবা বাবা রে।

'এস এস বঁধু এস'—বলে একটি গানে প্রেমের জন্যে অন্ধভাবে ছুটে মরা আর তার জন্য নারীর বিশেষ অবদান মাথায় রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের নিবেদন—

এস, এস, বঁধু এস! আধ ফরাসে ব'স,
কিনিয়া রেখেছি কল্‌সি দড়ি (তোমার জন্য হে)

আবার কবি পিয়াকে নিবেদন—

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা ঢাকা হন অমনি বঁধু, একটু যদি মুদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
এমনি ওড়েন উধাও হয়ে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি!

প্রেম যে অন্ধ তার অনেক প্রমাণ আছে দ্বিজেন্দ্র-গানে। তারই সরস প্রকাশ—

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক্ মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে।

দ্বিজেন্দ্রর হাসির গানে প্রেমের পরই আছে বিরহের গান—

বিরহ জিনিসটা কি
নাইরে নাইরে আর বুঝিতে বাকি!
যখন দাঁড়ায় আসি রমাকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নৃত্য,

'বিরহ যাপন' গানেও কৌতুকের আর-এক রূপ উদ্ভাসিত—

তোমারই বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই—
এখন ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমই।
কি বলবো আর—পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ।

প্রেমের ক্ষেত্রে অনুতাপ অত্যন্ত পরিণামী বিষয়। সেই অনুতাপ বিষয়ে গান—

এখন তাহারে আমি পেলে যে কি করি?
হাসি কিম্বা কাঁদি কিম্বা হাতে কিম্বা পায়ে ধরি?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুঝি তারে বলি 'প্রিয়ে,
যা হবার তা হয়ে গেছে, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি,

'নতুন প্রেম' নামক গানে প্রেমের প্রথম উপলব্ধি Pun-এর ছটায় প্রাণিত—

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিস।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে, আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুই ও একটা কিনিস্।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এ ছাড়াও নানা বিষয়ে বহু হাসির গান রচনা করে গেছেন, সেখানে বসন্ত, বর্ষা, বিলেত, বানর, কোকিল, শেয়াল, শালিক যেমন আছে আবার 'দার্শনিক' গানে জগৎ, পৃথিবী, সংসার, পূর্ণিমা মিলন (যা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়িতে প্রতি পূর্ণিমায় যাপিত সাহিত্য আসর) জাতীয় গানও আছে। অন্যদিকে আহার ও পানীয় বিষয়ক হাসির গানও আছে। যেমন চা, পান, সন্দেশ (উহু, সন্দেশ বোঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া/উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি! কত না বুদ্ধি করিয়া।), ভাঙ, সালসা খাও, সুরা (এ জীবনে ভাই একটুকু যদি মিলন আমোদ চাও রে—/তালে মাঝে মাঝে-মাঝে, মন রে আমারে, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।)

এ ছাড়াও 'নানাবিধ' শিরোনামে প্রেম পরিণাম, মদ্যপ (আমি বুঝি সং?/তোমরা যে সব হাসছো দেখে আমায় বেজায় নতুন ঢং।), আমি যদি পিঠে তোর ওই (আমি যদি পিঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে;/তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পিঠে যে

তোরা ব্যথা লাগে?) এবং পরিশিষ্টে একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গীত (কোরাস গান)-ও কিছু আছে। যেমন—বেশ করেছ, হতে পার্ত্তাম জানে না, ভাবনায়, ধর ধর, বারবারই বলে গেছি, I thoroughly agree ইত্যাদির ভালোমন্দ বেশ কিছু হাসির গান।

এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের কর্মজীবন সুখের ছিল না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বারবার বাদ বিসংবাদ হয়েছে এবং এতে চাকরি জীবনে উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। সেইসব বিষয়ও তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে হাসি মস্করা ও টিপ্পনীর আকারে—'চাকরি করা হয়রানি' ('মোরা সবাই ঠিক করেছি যে চাকরি করা হয়রানি!)

এই প্রসঙ্গে 'পূর্ণিমা মিলন' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে সেই আসরের বর্ণনা কিঞ্চিৎ হাস্যরসাদির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে—

এটা নয় ফলারে ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হয়েছে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হবে কালহরণ।
হোক না, ধনী গরীব বড় ছোট সবারি হেথা একাসন।
হেথায়, হবে না ক বক্তৃতা কি যুক্তি শূণ্য উপদেশ;
আমরা আসি নি ক জারিজুরি কর্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসি নি ক কর্ত্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন;
হেথায়, নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি টান;
তাঁদের কর্ত্তে হবে পরস্পরে প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায় অনুচ্চ কলরবে মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শুনুন এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্ব্বেন না কেউ হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।

১৯০৪ সালের দোল পূর্ণিমায় এই পূর্ণিমা মিলনের আসরে রবীন্দ্রনাথও এসেছেন এবং 'সে যে আমার জননী' এই গানটি গেয়েছেন। এই আসরে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনাগরিক দ্বিজেন্দ্রলাল বা ডি.এল. রায় ১ নং ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে যে আঘাত পান, তা তাঁর জীবনের গতি বদলে দিয়েছিল। ১৯০৩ সালের ১৯ নভেম্বর এই বাড়িতে তাঁর স্ত্রী সুরবালা মারা গেলে দ্বিজেন্দ্রলাল খুবই ভেঙে পড়েন। একমাত্র ছেলে মন্টু (শ্রীমান দিলীপ কুমার) ও মেয়ে মায়াকে নিয়ে তিনি হঠাৎ অথই জলে পড়েন। এই সময়েই শোক-সন্তপ্ত কবি লেখেন—

একটি ছেলে একটি মেয়ে—একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে
হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায়;

সারা বছর ঘুরে বেড়ায় জানে না সে হতভাগ্য
তাদের নিয়ে কোথায় দাঁড়ায়। (হতভাগ্য)

তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৮ বছর। দ্বিজেন্দ্রলালকে অনেকে আবার বিয়ে করতে বললেও তিনি রাজি হননি। স্ত্রীর মৃত্যুর আগে তিনি আবগারি বিভাগে চাকরি করতেন বলে মৃত্যুকালে স্ত্রীর কাছে থাকতে পারেননি। স্ত্রীর মৃত্যুতে সান্ত্বনা লাভের জন্য কবির প্রবোধ—

দুঃখ মিছে, কান্না মিছে;
দুদিন আগে, দুদিন পিছে ;
একই পাথারে গিয়ে মিলেছে সব নদী।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আবগারি বিভাগের চাকরি ছেড়ে আবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নেন। এরপর কবি নাটক লেখার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। লেখেন প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবারপতন, নূরজাহান, সাজাহান ইত্যাদি নাটক। বেশ কিছু প্রহসনও তিনি লিখেছেন। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' নামীয় বিখ্যাত গানটির রচনা সম্পর্কে জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী বলেছেন যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় গয়ায় এই গানটি রচিত হয়েছিল। আবার এই গানটি গাইতে গিয়েই স্যার কৈলাসচন্দ্র বসুর বাড়িতে হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে কবি জ্ঞান হারান। পরে এর থেকে সন্ন্যাস রোগের সূচনা এবং এতেই তাঁর মৃত্যু ১৯১৩-র ১৭ মে।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর আগে 'মন্দ্র', 'আর্যগাথা' ইত্যাদি কাব্য লেখা হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দকুমার চৌধুরী লেনে একটি বাড়ি করেন। স্ত্রীর নামে এই বাড়ির নামকরণ হয় সুরধাম। এই রাস্তার বর্তমান নাম ডি.এল. রায় স্ট্রিট। জীবনের শেষ ক-বছর তিনি এই বাড়িতেই কাটান। এখানেই তিনি সীতা, সোরাব-রুস্তম, পুনর্জ্জন্ম (প্রহসন), কল্কি অবতার (প্রহসন), ত্র্যহস্পর্শ (প্রহসন), চন্দ্রগুপ্ত (নাটক), ত্রিবেণী (কাব্য), পরপারে (প্রহসন), আনন্দ বিদায় (রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যর সমালোচনামূলক প্রহসন), বঙ্গনারী, সিংহল-বিজয় (নাটক) প্রভৃতি লেখেন। বেশির ভাগই মেলোড্রামাটিক ট্র্যাজিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আষাঢ়ে' বা গুটিকতক হাসির গল্প (কবিতার আকারে) লিখেছেন।

'সিংহল-বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করতে গিয়েই ইভনিং ক্লাবে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে শনিবার অচেতন হয়ে পড়েন এবং রাত প্রায় সাড়ে ন-টায় তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর আগে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পেলেও এই বিখ্যাত পত্রিকার প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর প্রতি নিবন্ধকারের বিনম্র প্রণাম। এই বছরেই তাঁর একশো উনষাট বছর।

বিসর্জন থেকে রক্তকরবী রবীন্দ্র-নাটকে রাজা

প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক E. Thomson রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন—

'His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action.' ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত রবীন্দ্র নাট্যরচনা কাজের ব্যাপ্তি। আলোচ্য প্রবন্ধের সময়কাল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ। 'বিসর্জন' থেকে 'রক্তকরবী'। রবীন্দ্র-নাটকে রাজা চরিত্র শুধু শাসনকর্তাই নয়। তাঁর রূপক-সাংকেতিক বেশ কয়টি নাটকে ঔপনিষদিক ভাবনায় উপস্থাপিত ঈশ্বরকল্প। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে রবীন্দ্র কথিত শেকসপিয়রীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেখানে অনেকক্ষেত্রেই চরিত্রই নাট্য-ঘটনার নিয়ন্তা। প্রথম পর্বের নাটক হিসেবে ঘটনাকৌশল ও নাটকীয় সংস্থানের তন্নিষ্ঠতায় এটি তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যনাট্য। রবীন্দ্র সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নাটকটিকে 'রোম্যান্টিক ট্র্যাজিডি' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

রবীন্দ্র-নাট্যচর্চার ইতিহাসে বিবিধ সৃষ্ট প্রকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, পত্রসাহিত্য, চিত্রকলা, প্রবন্ধ ও সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখায় অনায়াস বিচরণ করেছেন। 'হিন্দুমেলার উপহার' দিয়ে তাঁর কাব্যরচনা শুরু। শুধু নাটকের দিকে দেখলে দেখা যায় যে, তিনি শ্যারাড, অপেরা, ব্যঙ্গকৌতুক, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ঋতুনাট্য, রূপক, সাংকেতিক, তত্ত্বনাটক ইত্যাদি নানা ধরনের রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক, কবিতাকেন্দ্রিক কাব্যনাটক, নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি রচনা ছাড়াও একই নাটকে নানা সময়ে নানা নামে পরিবর্তন ও রূপান্তর করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে কাব্য কবিতা, গান ইত্যাদি কবিও নানা সময়ে নানা রূপান্তর ঘটিয়েছেন। নিজে নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, গায়ক, মঞ্চনির্দেশক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক থেকে 'রক্তকরবী'তে রাজার ভূমিকা

আলোচিত। 'বিসর্জন' নাটকে প্রথা যখন প্রেমকে বিনাশ করতে চাইল প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অপর্ণা চরিত্রের ভিতর দিয়ে সেই ঘটনাই প্রদর্শিত। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি চিরায়ত বলিদানের প্রথা বজায় রাখতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই কারণে তিনি রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রানি গুণবতীর মধ্যে বিরোধ বাধাতে এবং রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায় ও ত্রিপুরার প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিদ্রোহী করে তুলতেও পিছপা হননি। কিন্তু আসল বিদ্রোহের মেঘ যে সঞ্চিত তাঁর গৃহকোণে এই সংবাদ রঘুপতি জানতেন না। একদিকে গুরুভক্তি ও প্রথার প্রতি অচল বিশ্বাস এবং অপরদিকে মানবিক প্রেমের আকর্ষণ এই দুইয়ের সংঘাত ও সংশয়ের মাঝখানে দোলায়িত চিত্ত তাঁর পুত্রপ্রতিম জয়সিংহ যখন আত্মহত্যার দ্বারা সংশয়ের অবসান ঘটাল, তখন সেই ব্রাহ্মণ গর্বদীপ্ত রঘুপতি চরম পরাজয়ের আঘাতে ভেঙে পড়লেন। এই আঘাতের মধ্য দিয়েই তিনি মোহমুক্ত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, নিষ্ঠুরতার সাহায্যে দেবপুজো হয় না, কারণ দেবী তো দয়াময়ী, প্রেমময়ী। প্রেম ও দয়াতেই তাঁর সত্যি আবির্ভাব। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন, 'এই নাটকে বারবার এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।...নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল—তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম জয়যুক্ত হল।' তাই এটি তত্ত্বনাটক। রাজা গোবিন্দমাণিক্য নিত্য মানবধর্ম, উদার মনুষ্যত্ব, সহজাত প্রেম ও অহিংসার প্রতীক আর পূজারী রঘুপতি অর্থহীন ধর্ম, যুক্তিহীন প্রথা, মনুষ্য রচিত আচারবিধি ও হিংসার প্রতীক। নাটকে লিরিক উপাদানের প্রাধান্য থাকলেও নাটকটি কবির মানবধর্মে আবশ্যিক ভাবসত্যতা আর প্রতিষ্ঠিত কাব্যনাট্য রূপে প্রকাশিত। 'মালিনী' (১৮৯৬), 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' এক শ্রেণির নাটক। ভাবের দিক থেকে এরা নিকটবর্তী, কারণ ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়ে সত্যোপলব্ধির তাত্ত্বিক ভাব (সব ক-টিতেই 'রাজা' আছে) তিনটি নাটকেই বিদ্যমান। 'বিসর্জন' নাটকেও রাজা চরিত্রের উপস্থিতি আছে। এই নাটকে ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বা মানবধর্মের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। রাজকন্যা মালিনীর ধর্ম শাস্ত্রবর্ণিত কোনো বিশুষ্ক নিশ্চল আচার মাত্র নয়, আপন অন্তরের করুণাই তাকে নবধর্ম প্রবর্তিকা দেবীরূপে মানবলোকের দিকে অগ্রসর করেছে। মালিনীর এই নবধর্মের পরম শত্রু বিপ্লবী ক্ষেমঙ্কর; কিন্তু ক্ষেমঙ্করের আবাল্য সুহৃদ সুপ্রিয় মালিনীর ধর্মমতে বিশ্বাসী। অবশেষে সুপ্রিয়র করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণাধর্মের চরম পরীক্ষা ও তার জয় হয়েছে। এই নাটকের তাৎপর্য সম্বন্ধে নাট্যকারের উক্তি—'পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এই রূপ ('প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মতো) দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি।' ভাবের ক্ষেত্রে এই নাটক 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'-এর

সমগোত্রীয় হলেও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দুটি নাটক ভিন্নতর। আগের নাটকদ্বয় শেকসপিয়রীয় আদর্শে গঠিত কাহিনি ও উপকাহিনির ঘনঘটায় বহু দৃশ্যে বিভক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক। কিন্তু 'মালিনী' মাত্র চারটি দৃশ্যে বিভক্ত একটি সংহত একাঙ্ক নাটক। প্রখ্যাত গ্রিক নাটক সমালোচক ট্রেভেলিয়ান এই নাটকে গ্রিক নাটকের (ট্র্যাজেডির) ত্রিবিধ ঐক্য লক্ষ করেছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন তিনি কোনো গ্রিক নাটকের দ্বারা প্রভাবিত নন। নাটকের ভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকার বলেছেন—'মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত ও দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।' এই কারণে এই নাটকের ট্র্যাজেডি অধিকতর ঘনীভূত ও নাট্যগুণ সম্পন্ন। তা সত্ত্বেও এর চরিত্রাঙ্কণ হৃদয়াবেগের ধারা ধাবিত হওয়ায় একে ক্লাসিক্যাল নাটক না বলে, রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিই বলা চলে। 'শারদোৎসব' (১৯০৮) নামক ঋতুনাট্য রচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম প্রবেশ করেন রূপক সাংকেতিক নাটকের জগতে। 'শারদোৎসব' বহুল অভিনীত মঞ্চসফল নাটক। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যোগাযোগ সেই ভাবতত্ত্বই এখানে নিহিত। ছুটির ভিতর দিয়ে মানুষ সহজে আনন্দকে উপভোগ করে, কিন্তু সেই ছুটিকে অর্জন করতে হয় দুশ্চর দুঃখের সাধনায়, কর্ম এবং কর্তব্যের ঋণশোধেই মানুষের যথার্থ ছুটি ও মুক্তি। নাট্যকার স্বয়ং এই ভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি—প্রত্যেকের ভেতরকার মূলভাব ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করার জন্য। তিনি খুঁজছেন সাথী। পথে দেখলেন যে ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্য উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে উপনন্দ সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্য নিভৃতে বসে একাকী কাজ করছিল। রাজা বুঝলেন যে এই তাঁর সত্যিকার সাথী, কেননা ছেলেটির সস্নেহ শরৎ প্রকৃতির সত্যিকার আনন্দের থেকে, আর ওই ছেলেটির দুঃখের সাধনাই আনন্দে মিলিত হয়ে ঋণ শোধ করেছে। সেই দুঃখই মধুরতম।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) একটি রোম্যান্টিক ইতিহাসনির্ভর নাটক। একটা মহৎ আদর্শের কারণে যন্ত্রণাভোগ এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য। রাজা শক্তিমদে মত্ত হয়ে পাপ করেন, আর একজন দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন—'মুক্তধারা ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে গল্প সূত্রে মিল আছে, কোন কোন চরিত্রও দুই নাটকে অভিন্ন, তৎসত্ত্বেও নাটক দুটি যে ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্তে কাহিনির প্রাধান্য আর মুক্তধারায় প্রাধান্য তত্ত্বের।' (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, পৃ. ২) নাটকের কাহিনিতে আছে যে বিভা চরিত্র ও স্বামীর নীচতার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে সব সুখকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। তত্ত্বপ্রাধান্য এর নাট্যরস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছিল। তবে এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম একটি বিবেক জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যার নাম ধনঞ্জয়

বৈরাগী, অবশ্য এই চরিত্রের বীজ ছিল আগের নাটক শারদোৎসবের 'ঠাকুরদা' চরিত্রে। এই ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আবার 'মুক্তধারা' নাটকে এবং কিছুটা রূপান্তরিত অবস্থায় 'অচলায়তন' (এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'গুরু')-এর দাদাঠাকুর এবং 'ডাকঘর', 'রাজা' ও 'অরূপরতন'-এর 'ঠাকুরদাদা' এবং 'ফাল্গুনী'র বাউল চরিত্রে দেখা মেলে। সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—'রবীন্দ্র-নাটকে এই জাতীয় চরিত্র রসিক অথচ বৈরাগী, আত্মভোলা, চিরনবীন, সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যসন্ধ; স্বচ্ছ, সুনির্মল, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু, দুঃখী ও দুর্গতদের পরম সুহৃদ, নিত্য সত্যধর্মের পরম সাধক।'

ইউরোপের মরিস মেটারলিংকের রূপক সাংকেতিক নাটকের ধারণা রবীন্দ্র-নাটকে দেখা যায়। 'রাজা' (১৯১০) নাটক থেকে 'রক্তকরবী' (১৯২৬/১৯২৪) এই চোদ্দো-পনেরো বছরের মধ্যে এই শ্রেণির দশটি নাটক তিনি লিখেছেন। 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকে মানবহৃদয়ের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধবিচার। এই নাটক দুটিতে যাঁকে রাজা বলা হয়েছে তিনি ভগবান বা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন, অন্যদিকে সুদর্শনা ও অমল মানবসত্তার প্রতিনিধি স্বরূপ।

রূপের সাধনা থেকে অরূপের সাধনায় উত্তরণ 'রাজা' (১৯১০) নাটকের মূল বিষয়বস্তু। রানি সুদর্শনার মনে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপতৃষ্ণা, তাই তিনি রাজাকে খুঁজছিলেন বাইরের জগতে, সুবর্ণের রূপ দেখে তাঁর কাছেই নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। এই নাটকের বিষয়বস্তু অনেকাংশেই মেলে পরবর্তীতে লেখা 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের সঙ্গে। অথচ অন্তরের অনুভূতির মধ্যে পরম সুন্দরের স্বরূপ বুঝে তারপর বাইরে খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যায় এই সত্য রানি বিস্মৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-গানে তাই পাই, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে' ইত্যাদি। রানির সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাঁকে এ কথা স্মরণ করালেও তিনি মানতে চাননি। তখন কেমন করে আগুন লাগল অন্তঃপুরে, অন্তরের রাজাকে ছেড়ে বাইরের রাজাকে খুঁজতে গিয়ে রাজার দলে লড়াই বাধল, সেই অগ্নিদহনের ভিতর দিয়ে কেমন করে রানি সুদর্শনার নিজের আপন মনের মানুষ রাজার সঙ্গে মিলন হল সেই কাহিনিই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। দুঃখের ঘাতে রানির অভিমান ক্ষয়ে গিয়ে নতুনভাবে রাজার সঙ্গে মিলন হল। তার ফলে রানি সত্যিকারের প্রেমে ডুবে গিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয় এবং প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এই জাতীয় রহস্যময় সাংকেতিক নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কখনও ঘটনাশ্রয়ী, কখনও চরিত্রগত ভাবধারাশ্রয়ী। রবীন্দ্র অধ্যাত্ম আকুতিই নাটকে রূপলাভ করেছে।

'অচলায়তন' (১৯১১) একদিকে মুক্ত জ্ঞান এবং অন্যদিকে অন্ত্রমন্ত্র জাত্যাভিমানের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলছে। নাটকে জ্ঞানমার্গী শোনপাংশু ও ভক্তমার্গী দর্ভকের দল যে অচলায়তন গড়ে তুলেছিল 'গুরু' এসে সেই অচলায়তন ভেঙে দিলেন। জড়তার বাধাকে চূর্ণ করলেন। (গান—'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না')।

পরবর্তী বিখ্যাত রূপক সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর'। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ নাটকগুলির মধ্যে অনবদ্য এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যেও অন্যতম। নাটকে অদৃশ্য রাজাকে কেন্দ্র করে গৃহবন্দি রুগ্ন অমল, দূরবর্তী কল্পলোকের পাঁচমুড়া পাহাড়, নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ধাবিত পথ, ডাকঘর, রাজার চিঠি, ঠাকুরদা, রাজ-কবিরাজ, সুধা প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে এক স্বপ্নময় অতীন্দ্রিয় জগৎ গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে একে 'গদ্যলিরিক' বলেছেন। সত্যিই এই নাটকে গদ্য সংলাপেও গীতিমাধুর্য ঝংকৃত। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছিলেন—'ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।...চল চল বাইরে চল, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে সেখানকার মানুষের সুখ দুঃখের উচ্ছাসন-বেদনা মনে জেগে উঠল।...কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে, সেই চঞ্চলতাকে ভাষাকে 'ডাকঘর'-এ কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।' এই নাটকে অমল চরিত্রের কথা ও এক রুদ্ধজীবন বালকের বেদনার কাহিনি। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার সমগ্র মন ও আত্মা যেন ক্রন্দনরত। কিন্তু মিলন অসম্ভব। চারিদিকে নানা বাধা। মাধব দত্ত (পিসেমশাই) ও কবিরাজরূপী সংসার এবং মোড়লরূপী সমাজের বাধা। অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমল সেই সুদূর অজানার—রাজার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল। 'ডাকঘর' নাটক মূলত মানবহৃদয়ের সঙ্গে ভগবানের তথা মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার মিলন ব্যঞ্জিত হলেও নাট্যকার অনির্দেশ সুদূরের প্রতি তীব্র উৎকণ্ঠা ও পিপাসা—বাধাহীন অসীমে চিত্ত প্রসারণের ব্যাকুল চেষ্টা করেছেন ('সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/ তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর')। সর্বোপরি মৃত্যুর একটি ছায়াময় ধূসর আবরণ নাটকটিকে মিস্টিক (Mystic) করে তুলেছে। সাংকেতিকতার দিক থেকে অমল মানবাত্মা ও রাজা বিশ্বাত্মার প্রতীক। সুধা নাম্নী বালিকাটি সৌন্দর্যের প্রতীক। নাটকের শেষ দৃশ্যে সুধার হাতে ফুল প্রেমের প্রতীক। নাটকের পাহারাওয়ালা পরবর্তী নাটকে আরও তীব্র রূপে প্রকাশিত অন্য চেহারায়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে ট্র্যাজিক মাধুর্য দিয়েছেন, পরবর্তী 'ফাল্গুনী' (১৯১৩) বসন্তের বন্দনাগীতি সমৃদ্ধ নাটক হলেও আসলে এটি তত্ত্বনাট্য। শীতের ভিতর দিয়ে বসন্ত যেমন নতুন করে ফিরে আসে, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মানুষও তেমনি নবজন্ম লাভ করে, এটাই 'ফাল্গুনী' নাটকের মূলতত্ত্ব, এ 'গীতা' বা 'উপনিষদ'-এর ভাবনারই প্রকাশ।

পরবর্তী 'গুরু' নাটক 'অচলায়তন'-এর রূপান্তর আর 'অরূপরতন' 'রাজা' নাটকের রূপান্তরিত চেহারা, 'ঋণশোধ' পূর্ববর্তী 'শারদোৎসব' নাটকের নবরূপ, ('মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি') এই গীত গুঞ্জরিত।

এরপর রবীন্দ্রনাথ যে দুটি রূপক-সাংকেতিক নাটক লিখেছিলেন, এদের ভাবচিন্তার পটভূমি প্রথম মহাযুদ্ধের রক্তস্নাত ইউরোপ। যেখানে যন্ত্রসভ্যতার প্রবল

প্রতাপ মানবহৃদয়ের সৌকুমার্যকে নিষ্পেষিত করে শেষ করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে, ভয়ংকর যুদ্ধের ভিতর দিয়ে শক্তি ও যৌবনের লীলাপ্রাচুর্যের জয় ঘটেনি। বরং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে নিষ্ঠুর যন্ত্রদানবের জয়লিপ্সু বর্বর সাম্রাজ্যবাদের শোষণ বেশিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যান্ত্রিক সভ্যতার বর্বর নিষ্ঠুর রূপ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে প্রবলভাবে আন্দোলতি করেছিল। 'মুক্তধারা' (১৯২০) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৪) তারই ফলশ্রুতি। 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মানুষের মধ্যে পাহাড়ের জল নিয়ে বিতণ্ডা। এখানে যন্ত্রের সাহায্যে বাঁধ দিয়ে উত্তরকূটের নিম্নগামী স্বাভাবিক জলধারাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। এখানে যেন সাম্রাজ্যবাদের দুঃসহ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রাণের ঘোষণা যান্ত্রিকতা এবং বিকৃত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব। যন্ত্রশক্তি সহজ জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। যা ছিল রাষ্ট্রীয় পীড়নের কারণস্বরূপ। উত্তরকূটের রাজার মধ্যে ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তা; যন্ত্রকে আশ্রয় করে বিজিত জাতিকে তথা শিবতরাইয়ের লোকদের তিনি দমন করতে চেয়েছিলেন। বিরাটকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ দিয়ে তিনি ঝরনার মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করে শিবতরাইয়ের লোকেদের পিপাসার জল বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন—'নমঃ যন্ত্র'—ইত্যাদি। কিন্তু রাজকুমার অভিজিৎ প্রাণ দিয়ে সেই বাধা অপসারণ করেছিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী সকল শিবতরাইকে জাগ্রত করেছিলেন তাঁর নানা উদ্দীপনামূলক সংলাপ ও গানে। 'আগুন আমার ভাই/আমি তাহারই গান গাই', অথবা 'হে ভৈরব শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ' ইত্যাদি গানের দ্বারা। সাংকেতিকতার দিক থেকে অভিজিৎ নিপীড়িত ও বিদ্রোহী মানবাত্মার প্রতীক। ধনঞ্জয় বৈরাগী নির্ভীকতার ও সহিষ্ণুতার প্রতীক, যন্ত্ররাজ বিভূতি শক্তিমদমত্ততার প্রতীক। 'Ideas of Good and Evil'-এ W.B Yeats লিখেছিলেন—'Symbols are the only things free from all bonds to speak of perfection.' পৃ. ১০০।

'মুক্তধারার' রূপান্তরিত রূপ 'ভৈরবের বলি'। 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের প্রায় শেষ পর্বের অত্যন্ত আলোচিত রূপক-সাংকেতিক নাটক। এখানে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রাণের ও প্রেমের বিদ্রোহ। আর এখানে মাটির তলায় রাজা, যক্ষপুরীর স্বর্ণলোভী ও সঞ্চয়ী রাজা ভয়ংকর জালের আড়ালে আবৃত। আনন্দ, সৌন্দর্যের পথ সেখানে রুদ্ধ। সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত সেখানকার মানুষরাও রাজার অর্থলিপ্সা পূরণের যন্ত্রে পরিণত হয়ে নিজেদের নাম-পরিচয় হারিয়ে কেবল আঙ্গিক সংখ্যা চিহ্নিত হয়ে খনি থেকে তাল তাল সোনা তুলে আনে। এরা যেন কয়েদখানার নামহীন নম্বরযুক্ত কয়েদি, মনে পড়ে অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'বিশপস ক্যাস্টেল স্টিকস' নাট্যটি। জীবনহীন, মনুষ্যত্বহীন সেই প্রেম-সৌন্দর্যহীন যক্ষপুরীতে আনন্দের স্পর্শ নিয়ে জীবনের চঞ্চলতা নিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হল নন্দিনী। তার হাতছানিতে নিশ্চল যক্ষপুরী চঞ্চল হয়ে

উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজা, মোড়ল, পণ্ডিত, কিশোর, কেনারাম সকলেই। শেষপর্যন্ত রাজা যৌবনের প্রতীক নন্দিনীর প্রেমভাবনা রঞ্জনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে নিজের চারপাশের কঠিন লৌহজালকের আবরণ ভেদ করে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছিলেন। নাটকের রক্তকরবী ফুল অপরাজেয় প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। 'রাজা' লোভ ও শক্তির তথা ধনিকতন্ত্র ও যান্ত্রিকতার প্রতীক। সর্দার শ্বসন ও দহনের পীড়নের প্রতীক, 'অধ্যাপক' জড়বাদ ও বস্তুবাদের প্রতীক। বিশু পাগল অসীম অপরিতৃপ্ত ও বিরহবেদনার প্রতীক। নন্দিনীর প্রেমাস্পদ যে রঞ্জনের কথা বলা হল, সে প্রাণশক্তিরও প্রতীক। কিশোর সৌন্দর্যসাধকের প্রতীক। গোঁসাই, পুরাণবাগীশ এরা সনাতন অন্ধ সংস্কারের প্রতীক। রাজার লৌহ আবরণ অনিয়ন্ত্রিত কামনাবাসনা লোভ ও যন্ত্রবদ্ধতার প্রতীক। নীলকণ্ঠ পাখির পালক অনন্তের ইঙ্গিতবাহী। ধ্বজা জয়শক্তির চিহ্ন। নন্দিনী আনন্দ ও প্রেমের প্রতীক। নন্দিনীকে পাবার জন্য রাজা জোর খাটান, কিন্তু নন্দিনীকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া নিজের করে কারও (হয়তো রঞ্জন ছাড়া) পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-তত্ত্বনাটকে তিনটি মূল বিষয় আছে। ১) মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, ২) মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ৩) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক।

রক্তকরবী নাটকে প্রায় ২৭টি সংগীত আছে। নন্দিনীর গান—'ভালোবাসি ভালোবাসি', সম্মেলক গান—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'। বিশু পাগলের অনেক গান, যেমন একটি—'ওগো দুঃখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাবো, ওগো ঘুম ভাঙানিয়া তোমায় গান শোনাবো' ইত্যাদি।

আগেই উল্লিখিত রবীন্দ্রগানও Vehicle of Ideas'। যা হোক, 'বিসর্জন' থেকে 'রক্তকরবী' রবীন্দ্র-নাটকে রাজা চরিত্রের নানা রূপের ভাবের চিত্র লক্ষ্য করা গেল। সবশেষে সমালোচক অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তি দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানা হবে, 'রবীন্দ্রনাথের নাটক সাংকেতিক। তাহার মধ্যে রূপকের স্পর্শ আছে, কিন্তু অরূপ অসীমের সন্ধানই তাহার প্রধান লক্ষ্য।'

তথ্যসূত্র:

১। E. Thompson—Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist, Riddhi Publication, Kolkata।

২। ড. প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র কাব্যনাটকের অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ, দে পাবলিকেশন, কলকাতা।

৩। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য, রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

৪। প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ।

৫। ড. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৬। ড. সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা।

৭। অশোক সেন, রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা।

৮। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজা ও রানী, গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা।

সুকুমার রায়ের নাটক

সুকুমার রায়ের নাটকের কথা বলার সময় সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের 'আমার বড়দা' শীর্ষক লেখাটির কথা মনে পড়ে। যেখানে লীলা মজুমদার লিখেছিলেন, 'বড়দার কলেজ জীবনের আরো গল্প শুনতাম। তখন থেকেই মজার মজার নাটক লেখেন। শুধু লেখেন না, বাড়ির ছেলেদের আর আত্মীয়স্বজন নিকট বন্ধুদের শিখিয়ে পড়িয়ে নাটক মঞ্চস্থ না হলেও মেঝেস্থ হয়। না বলে বিছানার চাদর দিয়ে যবনিকা হয়, গোটা ধোপার পুঁটলি উধাও হয়—তা হবে না... ?' সুকুমার রায় নাটককে নিছক বিনোদন ভাবতেন না। তাঁর কাছে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নাটকও জীবনচর্চার অঙ্গ ছিল। লীলা মজুমদারই লিখেছেন, 'বড়দা অন্যের লেখা নাটক করাতেন না। নিজে লিখতেন, নিজে অভিনেতা বেছে নিতেন, নিজে শেখাতেন, অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন, অন্যরা সাহায্য করত। নিজে নায়ক হতেন না। সবচেয়ে হাঁদা গঙ্গারামের ভূমিকায় সবচেয়ে ভালো অভিনয় দেখাতেন।'

'নাটকে যে একটাও স্ত্রী চরিত্র থাকত না, সেটা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।'[১]

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় তার দাদার কথা এইভাবে—'বাবার লেখা 'কেনারাম ও বেচারাম' বলে একটা হাসির নাটক 'মুকুল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে (দাদা) খুব আনন্দ দিল।...গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল। এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিংবা পত্রিকায় বেরোত, তাই নিয়ে অভিনয় হত। এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল।'[২]

আবার শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ করেছেন—

'আমাদের ছোটবেলা কেটেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে 'বিচিত্রা' ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে সুকুমার রায় কখনও কখনও আসতেন, যেভাবে আসতেন আরও বহু নাম করা কবি, সাহিত্যিক। সেখানে নানা সাহিত্য আলোচনা, অভিনয় ও পাঠ হত। সেখানেই একবার সুকুমারবাবুর অসামান্য অভিনয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে তিনি কেদারের ভূমিকায়

অভিনয় করেছিলেন।'

তাঁর নাটকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অধুনা লুপ্ত 'রামধন বধ' ১৯০৫ সালে রচিত। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', ১৯১১-এর কোনো এক সময়ে রচিত। 'ঝালাপালা'-র রচনাকাল ১৯০৭ অথবা সুকুমার রায়ের বছর কুড়ি বয়সে লেখা। 'ভাবুক সভা'-র রচনাকাল ১৯১১-১২। এরপরে অন্তত তিন বছরের দূরত্বে রচিত হয় পরের নাটক 'শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম', পাণ্ডুলিপিতে পরিষ্কার ১৯১৫ সালের কথা বলা হয়েছে। 'চলচিত্তচঞ্চরি'-র রচনাকাল নিয়েও ভিন্ন মত আছে। সমগ্র শিশুসাহিত্যের সম্পাদকদ্বয়ের মতে এই নাটকটি 'শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম'-এর সমকালীন। শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এক স্মারক রচনায় জানিয়েছেন যে, তিনি ১৯১১ সালেই চলচিত্তচঞ্চরি-র অভিনয় দেখেছেন। কিন্তু শ্রী পুলকচন্দের মত সমগ্র শিশুসাহিত্যের সম্পাদকদ্বয়ের মতকেই সমর্থন করে। আবার অধ্যাপক বিষ্ণু বসু যুক্তিঋদ্ধ আলোচনার দ্বারা অনুমান করেছেন নাটকটি ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। 'অবাক জলপান' প্রকাশিত হয় তারও পাঁচ বছর পরে ১৯২০-তে। ১৩২৭ বাংলা সনের 'সন্দেশ'-এ জ্যৈষ্ঠে বেরোয় 'অবাক জলপান', ভাদ্রে 'হিংসুটি' এবং চৈত্রে ক্ষুদ্রকায় 'মামা-গো'।

তাঁর নাটকগুলির মধ্যে শিশুনাট্য হিসেবে পুরোপুরি শিশু-উপভোগ্য নাটক হল 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি' আর 'মামা গো', আর বয়স্কমুখীন নাটক হল 'ভাবুকসভা', 'শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম' আর 'চলচিত্তচঞ্চরি'। মনে হয় যে ননসেন্স ক্লাবের নাটকগুলি মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডলের জন্য রচিত যা শিশুবোধ্য, কিন্তু মনডে (মজা করে মণ্ডা ক্লাব বলা হত) ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাটকগুলিতে প্রাপ্তমনস্ক সমাবেশ দেখা যায়। যদিও সমগ্র শিশুসাহিত্য গ্রন্থে তাঁর সমস্ত নাটকগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ সেখানে প্রাপ্তমনস্কমুখীন নাটকগুলিও গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আদৌ শিশুমনস্ক নয়। বড়োদের নাটকগুলি আলাদা এই কারণেই যে, তাতে মজা কম না থাকলেও সেগুলিতে বয়স্কদের তত্ত্বগত ঝগড়া প্রাধান্য পেয়েছে। সে তুলনায় 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'মামা গো'-র শিশুত্ব নির্ভর চরিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না।

সুকুমার রায়ের নাটকে রঙ্গসরসতা নির্মাণের ক্ষেত্রে সংলাপের খুব বড়ো ভূমিকা আছে। সংলাপের ক্ষেত্রে অসংগতির শর্তে স্তূপীকরণ বা Cumulation (Cumulative Dialogue) করা হয়েছে। সংলাপ এখানে একক আবার একাধিক চরিত্রের প্রবহমান সংলাপও আছে। সংলাপে ভাষার ভূমিকাও কম নয়। সংলাপে স্তূপীকরণের পাশাপাশি সংঘাতের মিশ্রণও আছে যেমন 'ঝালাপালা' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দুলিরাম ও ঘেঁটুরামের সংলাপে আছে স্তূপীকরণ অর্থাৎ একজন এক কথা বলছে তো আর-একজন সেই কথাই আর-একটু ভিন্নভাবে আরও বাড়িয়ে বলছে,

ইংরেজিতে যাকে One-upmanship বলে, তারই দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। কিন্তু কেবলচাঁদ ওস্তাদ আসার পর ওই সংলাপের ধারায় একটা প্রতিমুখী দ্বন্দ্বের ঢেউ জেগে উঠছে। যেমন—

কেবলচাঁদ বলেছেন—'আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

ঘেঁটু ও দুলি। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

ঘেঁটুরাম। কোনো জন্মে নামও শুনিনি—

দুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—'

তবে সব স্তূপীকরণই যে এরকম একমুখী সংলাপের প্রতিযোগিতা তা নয়। একধরনের স্তূপীকরণে প্রসঙ্গের বিস্তার ঘটে, নতুন সংবাদ পাওয়া যায় তাতে নাটকের পটভূমিগত তথ্য বা information বেরিয়ে আসে। যেমন—'ঝালাপালা'য়—

কেদার। দারোগাবাবু আতা হ্যায়?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। হাতকড়া লেকে?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সারচ হোগা?

পুলিস। হাঁ বাবু—

আবার শুধু স্তূপীকরণেই মজা আছে লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ—

রাম। এত গোলামাল কিসের হে?

সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না তো?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হ্যাঁরে, তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি একার্থক, একরূপী বা একমুখী নয়, কিন্তু সবগুলির ব্যঞ্জনা এক। প্রশ্নাবলির এই আপাতবহুমুখিতা এবং অন্তর্গত ব্যঞ্জনার ঐক্য এই স্তূপীকরণকে বিশেষ আকর্ষক করে তুলেছে।

আবার 'চলচিত্তচঞ্চরি'-তে ও স্তূপীকরণ ও সংঘাতের মিশ্রণে সংলাপ চমৎকার এগিয়েছে, তবে তাতে স্তূপীকরণের আধিক্য, সংঘাতের অল্পতাই দ্রষ্টব্য। যেমন নিম্নোক্ত অংশে—

[রামপদর প্রবেশ]

সত্যবাহন। এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ। আরে দেখছিস আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে

আসবার দরকার কী বাপু? [আগের সংলাপের সঙ্গে স্তূপীকরণ সম্পর্ক]

জনার্দন। বলি এ কি বাঁদর নাচ—না সঙের খেলা, যে তামাশা দেখতে এয়েছে?

রামপদ। [স্বগত] কি আপদ! তখনি বলেছি আমায় ওখানে পাঠাবেন না—[আগের সংলাপের সঙ্গে বিরোধ-সম্পর্ক তৈরি করছে, তবে স্বগতোক্তি বলে সে বিরোধ প্রকাশ্য নয়, প্রচ্ছন্ন।]।

বাস্তবিক সুকুমার রায়ের সংলাপের গড়নই সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। ননসেন্স রচয়িতা সংলাপ রচনায় তাঁর যতরকম কৃৎকৌশল আছে তা প্রায় সবই ব্যবহার করেছেন। সুকুমার রায়ের আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যে পরিমিতিবোধ, নাট্যগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি' এবং 'চলচিত্তচঞ্চরি'। এ ছাড়া অন্যান্য নাটকগুলির সবদিক বিবেচনা করলে তারা ততটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না, যদিও নাট্যকার সুকুমারের প্রতিভার স্পর্শ অল্প হলেও সেগুলিতে আছে।

সহায়ক বই :

১। 'সুকুমার সমগ্র'—তুলিকলম প্রকাশিত।

২। 'সুকুমার রায় জীবন কথা'—হেমন্তকুমার আঢ্য।

৩। 'সুকুমার পরিক্রমা'—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি প্রকাশিত।

সংগীতকার নজরুল

রেকর্ডে ও নানাভাবে প্রাপ্ত নজরুল

খুব অল্পকথায় খণ্ডভাবে সংগীতকারকে এখানে ধরার চেষ্টা করা হবে। বলাই বাহুল্য বাংলা গানের জগতে নজরুল একটা জোয়ার এনেছিলেন। এদিক থেকে দেখলে বিশ শতকের ত্রিশের দশক বাংলা গানের জন্য যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বাল্য ও কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য প্রতিভা নজরুল ছোটো থেকেই পড়াশোনায় ভালো হলেও অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি। আসানসোলের শিয়ারশোল বিদ্যালয়ের থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পরেই রুটির দোকানে কাজ নেওয়া ও মধ্যে মধ্যে ঝুমুর, লেটো ও সাঁওতালি লোকসংগীতের চর্চাও করে গেছেন।

পরবর্তীকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পেশোয়ার ও অন্যান্য জায়গায় ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত থেকে যুদ্ধসংগীত, গজল, আরবি-ফারসি নানা সংগীত রপ্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছেন, মঞ্জু সাহেব, কেদার বক্স, দবীর খাঁ সাহেব প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেছেন, এবং অনেক বিখ্যাত সংগীতাচার্যের ঘরানার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, নিজে গভীরভাবে সংগীতশাস্ত্র পড়েছেন। ওস্তাদি গান হোক বা বাউল ভিখারির কাছে শোনা গান, সবই তিনি অত্যন্ত আয়াসের সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারতেন।

তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'সুর ও শ্রুতি'-তে সংগীতশাস্ত্র সম্পর্কে নজরুলের গভীরতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। যা তাঁর নানা সংগীতে তিনি ব্যবহার করেছেন। এমনকি আগামীতে বাংলা সংগীতের কীরূপ আসতে পারে তাও তিনি কল্পনা করেছেন। আধুনিক গান সম্পর্কে একটি ভাষণে তিনি বলেছেন—'বেণু' ও 'দোলনচাঁপা' দুটি রাগিনীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ন) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে সিমিট্রি (সামঞ্জস্য) বা ইউনিফরমিটির (সমতা) অভাব। কোনও রাগ বা রাগিনীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিনীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সংগীত শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের

প্রয়োজন তার অভাব আজকালের অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগিনী যদি তার গ্রহ ন্যাস এবং বাদী বিবাদী ও সম্বাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তা হলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।'

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গসংগীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতো মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। এই গান কখনও যেন রক্তাক্ত আত্মার সংগীত, কখনও কবি যেন তৃষ্ণার্ত নয়ন মেলে ধরেছেন আকাশের দিকে, কিন্তু মাটির স্পর্শ ছাড়েননি। কখনও মনে হয় ধরার দুলালীর জন্য হৃদয়ের আকুতি, যা গানের ভাষায় অপূর্ব দাহের সৃষ্টি করেছে। কখনও বা এই মাটির পৃথিবীর প্রতি মমতা ও ভালোবাসায় ভরা হৃদয় উচ্ছ্বাস। কখনও জীবনকাব্যের খণ্ডদৃশ্য, সুখদুঃখের মাঝে আশার অনুপ্রেরণা, মানুষের অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধুর প্রকাশ। ক্ষণিকের হাসি, অশ্রুর নিবেদনে একান্ত আপনার হয়ে উঠেছে এভাবে নজরুল-গীতি।

ভবিষ্যতের সংগীতের প্রতি বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা থেকেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে গানের জগতে এমন আলোড়ন ঘটানো, আকাশবাণীর জন্য তিনি এমন কিছু গান রচনা করেছিলেন বাণী ও সুরে যার কিছু বিশেষত্ব আছে বলে সে গানগুলিকে বলা হয় 'আকাশবাণী সংগীত'।

১৯৪২ সালের ৯ জুলাইয়ের পর থেকে জীবিত থেকেও কবির সংগীতচিন্তা থেমে গেছিল। তার আগে তিনি যে গান রচনা করেছেন তার সংখ্যা চার হাজারের কম কিছুতেই নয়, আরও বেশিই হতে পারে। প্রথম যুগে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য পরবর্তীকালে গ্রামোফোন, বেতার, নাটক, চলচ্চিত্র, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান বা শিল্পীদের অনুরোধে তিনি গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন। নজরুলের কবিতায় সুর দিয়ে প্রথম স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন মোহিনী সেনগুপ্ত। তাঁর উপদেশে নজরুল সংগীতরচনার নিয়মকানুন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন, নজরুল-গীতির প্রথম স্বরলিপির বই রচনা করেন জগৎ ঘটক, যা ডি.এম. লাইব্রেরি ১৯৩১ সালে প্রকাশ করে, নজরুল রচিত প্রথম গান রেকর্ড হয়েছে হিস মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে ১৯২৫ সালে। গেয়েছেন হরেন্দ্রনাথ দত্ত। অবশ্য তখন গীতিকারের নাম গোপন ছিল। আরও পরে 'তোরা সত্যি করে বল', 'পুঁথির বিধান যাক পুড়ে' রেকর্ড নং পি ৭,৩৫৭, ১৯২৮ সালের পর থেকে জনসাধারণের আগ্রহে ও চাপে বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি তাঁর গান রেকর্ড করাতে থাকে। এ সময় বিখ্যাত কে. মল্লিক গেয়েছেন, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', রেকর্ড নং পি ১১৫১৮, আঙুরবালা দেবী গেয়েছেন 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা'। রেকর্ড নং পি ৯৯৭৪।

কাজী নজরুলের লেখা এবং সুরারোপিত গানের মোট সংখ্যা রেকর্ড কোম্পানির হিসেব মোতাবেক ৩০০০-এর কাছাকাছি। তাঁর গান হিস মাস্টার্স ভয়েস, টুইন, কলম্বিয়া, মেগাফোন, হিন্দুস্থান, রিগ্যাল, দিলরুবা, সোনেলা ইত্যাদি কোম্পানিতে রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকের রেকর্ডে গীতিকার ও সুরকারের নাম থাকত না বলে সব গানের হিসাব পাওয়া যায় না। তাঁর অনেক গান অন্য গীতিকারের গানের মধ্যে মিশে গেছে। সে সময়ে বাংলা গানের জগতে তাঁর এমন প্রভাব ছিল যে, অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করে গান লিখতেন। অনেকসময় নিজেদের সুবিধামতো গানের কথা ও সুর পরিবর্তন করেছেন। সেই খণ্ডিত গান ছাপা হয়েছে। প্রকাশকদের অমনোযোগিতার কারণে অনেক গানের কথা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বহু গানের বইতে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণের প্রচুর অমিল লক্ষ করা যায়। এভাবে অনেক নজরুল-গীতি হারিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের নজরুল গবেষক-ড. রফিকুল ইসলাম 'নজরুল নির্দেশিকা'-য় ২২৫০ গানের প্রথম কলি প্রকাশ করেছেন। ঢাকার নজরুল একাডেমি রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে ২৮০০ গান সংকলিত করেছেন। আকাশবাণীর হারামণি, গীতি-বিচিত্রা ইত্যাদির সব গানগুলি উদ্ধার করা যায়নি। হারামণি ১৯৪০ সালে আকাশবাণী-তে প্রচলিত হয়েছিল। ওই বছরেই দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে ৬ অক্টোবর নজরুল আগমনী নামে একটি অনুষ্ঠান করেন আকাশবাণীতে। বিভিন্ন সুর সংযোজনে অনুষ্ঠানটি খুবই আকর্ষক হয়েছিল এর আগে ১৯৩৮ সালে ২৭ জানুয়ারি আকাশবাণীতে দেবীস্তুতি প্রচারিত হয় বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা। ১৯৩৯ সালে ওই অনুষ্ঠানে কবি নিজে আবৃত্তির অংশে যোগদান করেন। এ ছাড়াও বহু মানুষের কাছে অপ্রকাশিত আরও বহু গান হয়তো রয়ে গেছে। এ ছাড়াও কাজী নজরুল বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের গান রচনা ও সুর দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে 'পাতালপুরী', 'ধ্রুব', 'বিদ্যাবতী', 'সাপুড়ে', 'গোরা' (রবীন্দ্র উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র), 'চৌরঙ্গী', 'দীকশূল' ইত্যাদি। নাটকের জন্য রচিত গানগুলিতে সুরও দিয়েছেন যেমন মহুয়া, কারাগার, জাহাঙ্গির, সাবিত্রী, রক্তকমল, শ্যামলীর স্বপ্ন, পথের শেষে, সতী, সিরাজদৌল্লা ইত্যাদি। আলেয়া, গীতিনাট্য (আঠাশটি গান) তাঁরই লেখা এবং সুরারোপে পরিচালিত ও মঞ্চস্থ হয়েছিল, তাঁর রচিত রেকর্ড নাটকের সংখ্যাও কম নয় যেমন : বিয়েবাড়ি, পুতুলের বিয়ে, লায়লা মজনু, শ্রীমন্ত, ইদল ফেতর, মধুমালা, বিদ্যাবতী, প্রীতি উপহার ইত্যাদি। এ ছাড়াও আকাশবাণীর জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া, শাল পিয়ালের বনে, সাবিত্রী, বনের বেদে, হরপ্রিয়া, বিজয়া, মরুতৃষ্ণা, কাবেরী তীরে, আমার মদিনা, উদাসী ভৈরব, ছন্দসী, অন্নপূর্ণা, সেতুবন্ধ ইত্যাদি প্রায় পঁচাত্তরটি গীতি আলেখ্য রচনা করেছেন। ইরানের স্বপ্ন, ফারসি সংগীতের সুরে রচিত এক গীতি আলেখ্য। 'সারং রং' গীতি আলেখ্য সারং রাগের বিভিন্ন রূপ, মেজাজ ও পরিচয়

প্রকাশ করেন বহু গানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানটি আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ৬ এপ্রিল এবং ২৩ নভেম্বর। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন চিত্ত রায়, শৈলদেবী, ইলা ঘোষ প্রমুখ। 'নমস্কার' নামক আর একটি গীতি আলেখ্যর নাম শোনা গেলেও সেটি পুলিশের হেফাজতে নষ্ট হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

নজরুল-গীতির বিরাট হিমানীসমৃদ্ধ পর্বতের কথা জানা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে অর্থ সহায়তায় গবেষণা করলে হারিয়ে যাওয়া, অন্যের সংগ্রহে লুকিয়ে থাকা, হারিয়ে যাওয়া গান ও প্রবন্ধ, অভিভাষণের কিছু খাতা উদ্ধার করে প্রকাশ করতে পারলে, তবেই নজরুল-রচনার সম্ভার সঠিক ও সমৃদ্ধ ভাবে প্রকাশ পেত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যে চেষ্টা হয়তো তেমনভাবে না করলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সেই চেষ্টায় অনেকটাই হয়তো সফল হবে, কারণ নজরুলকে ওরা জাতীয় কবির সম্মান প্রদান করেছে। বহু মানুষের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেও নজরুলের গীতিসম্ভার সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব। নজরুল প্রচুর কৃষ্ণলীলা বিষয়েও ভক্তিগীতি, শ্যামাসংগীত, গজল, ধ্রুপদ ও অন্যান্য হালকা মার্গসংগীত ও গভীর ক্লাসিক্যালধর্মী গান রচনা করেছিলেন। তিনি 'চল চল চল', 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে' জাতীয় সমরসংগীত বা Marching Songs-ও রচনা করেছেন। এভাবেই সামান্য প্রয়াসে কাজী নজরুল ইসলামকে সম্মান জানানোর চেষ্টা করা গেল। দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও নতুনভাবে কিছু করতে পারেন কিনা। তুর্কি সংগীত থেকেও নজরুল সংগীত রচিত হয়েছে।

সহায়তায়: নজরুল গীতি অন্বেষা, সম্পাদক কল্পতরু সেনগুপ্ত।

সার্ধশতবর্ষে দেশব্রতী রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের সাহিত্যসেবীর ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) পরিচয় প্রধানত একজন ত্যাগী, নিবেদিতপ্রাণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশনেতা হিসেবে। দেশবাসী ভালোবেসে তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে (১৯২০), তাঁর আসল নামটি আজ প্রায় যার আড়ালে চলে গেছে। উপমহাদেশ বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের এতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁর আগে বা পরে বোধ করি আর কোনো রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যে জোটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুতে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দুটি: 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। আর নজরুল তাঁর মৃত্যুকে তুলনা করেছিলেন ইন্দ্রপতনের সঙ্গে। লিখেছিলেন: 'পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,/দেখিনি ক মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ।/কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ তলে,/না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে।/...বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনি ক চোখে তাহে/নাহি আফসোস, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে।...' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, নজরুলের চিত্তনামা (১৩৩২) কাব্যগ্রন্থের সবকটি কবিতা ও গানই চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যুর শোক থেকে লেখা। বইটি উৎসর্গও করেন নজরুল চিত্তরঞ্জন-পত্নী...বাসন্তীদেবীকে। এর 'ইন্দ্রপতন' নামক দীর্ঘ কবিতাটি যখন প্রথম আত্মশক্তি পত্রিকায় ছাপা হয় (১২ আষাঢ় ১৩৩২) তখন এতে এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছিল যাতে চিত্তরঞ্জন দাশকে পয়গম্বরদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। পরে কারো কারো আপত্তি সমালোচনার মুখে গ্রন্থভুক্ত করার সময় নজরুল কবিতাটি থেকে উক্ত পঙ্‌ক্তি কয়টি বাদ দেন।

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বিষয়টি চিত্তরঞ্জন দাশ বলা যায় উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামহ জগদ্বন্ধু দাশ ও পিতা ভুবনমোহন দাশ উভয়েই আইন ব্যবসার পাশাপাশি কাব্যচর্চা করতেন। চিত্তরঞ্জনেরও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত কবিতা দিয়ে। নিতান্ত কিশোর বয়সেই তাঁর লেখালেখির শুরু। তাঁর স্কুলজীবনের সহপাঠী

শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর ভাষায় চিত্ত ছোটোবেলা থেকেই কবিতা লিখত—পকেট ভরতি করে ছোটো ছোটো কাগজে সে কবিতা লিখে আনত।...টিফিনের ছুটির পর বাইরে এসে আমাদের সে লেখা দেখাত...।' (অপর্ণা: ২১) তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থায়, বিলাতে অবস্থানকালে, এমনকি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সক্রিয় রাজনীতিতে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত, তিনি যখন অত্যন্ত ব্যস্ত ও সফল ব্যবহারজীবী, তখনও তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। এই পর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা ছাড়াও নির্মাল্য, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় চিত্তরঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির খামখেয়ালি ক্লাবের সভ্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন। সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, জগদীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের সঙ্গে তিনি সাহিত্যপাঠ ও সংগীতচর্চায় অংশ নেন। ১৯১১ সালে চিত্তরঞ্জন যখন দ্বিতীয়বার পরিবার-পরিজন সহ বিলেত যান তখন রবীন্দ্রনাথ একদিন ইয়েটস ও রদেনস্টাইনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ সেখানে সোনার তরী সহ তাঁর কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন দাশও তাঁর সাগর-সঙ্গীত-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। এমনকি সাগর-সঙ্গীত নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছু আলোচনাও হয়। (অপর্ণা: ৫৯) কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংগীত আসরে খোদ রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই, যেমন সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী প্রমুখের আসা-যাওয়া ছিল। এই আসরেই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বসুর পাখোয়াজ সংগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও অমলা দাশ (চিত্তরঞ্জনের চিরকুমারী বোন ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী) একসঙ্গে গানও গেয়েছেন। (অপর্ণা: ৬৭) চিত্তরঞ্জন কন্যা অপর্ণার হিন্দুরীতিতে বিয়েদানের (১৯১৬) ঘটনায় ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা সে বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জন ও চিত্তরঞ্জনকে একঘরে করার আহ্বান জানানোর পরও ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। (অপর্ণা: ১০৬) সুতরাং রবীন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জনের পারস্পরিক বিরূপতার যে সংবাদটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার সূত্রপাত আরও পরে।

২

চিত্তরঞ্জন দাশের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় সম্ভবত তাঁর ১৯ বছর বয়সে, নব্যভারত পত্রিকার ফাল্গুন ১২৯৫ সংখ্যায়। কবিতাটির নাম ছিল 'বন্দী'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। ৫০টি কবিতা নিয়ে এই কাব্যসংকলনটির প্রকাশক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। মালঞ্চের অধিকাংশ কবিতারই বিষয়বস্তু প্রেম। মানবিক প্রেম। যেমন—

তোমার ও প্রেম সখী। তোমারি মতন,
অধর প্রশান্ত ধীর,
আঁখি কৃষ্ণ সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয় তীর, সৌরভ স্বপন।
এই কাছে এসে যাও,
ওই দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্ধ আলিঙ্গন।

এরই পাশাপাশি 'ঈশ্বর', 'বারবিলাসিনী', 'সোহং' ও 'অভিশাপ'-এর মতো কয়েকটি ভিন্নধর্মী কবিতাও রয়েছে তাঁর এ বইটিতে। এর মধ্যে প্রথমোক্ত কবিতা দুটি সমকালে কিঞ্চিৎ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বাসন্তীদেবীর বিয়ের সময় ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে এ ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়। আপত্তির একটি প্রধান কারণ ছিল চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যচর্চা, তাঁর রচনার বিশেষ প্রবণতা। প্রসঙ্গটির উল্লেখ করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন-কন্যা অপর্ণাদেবী লিখেছেন, 'বাবা 'ঈশ্বর-বিদ্রোহী' ও 'মাতাল' আখ্যা এই সমাজ থেকে পেয়েছিলেন তাঁর মালঞ্চতে প্রকাশিত 'ঈশ্বর' ও 'বারবিলাসিনী' কবিতার জন্য।' (অপর্ণা: ২৮) শুধু তাই নয়, চিত্তরঞ্জনকে এসময় এ মর্মে একটি লিখিত স্বীকারোক্তিও দিতে হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। (অপর্ণা:২৯) তো কী লিখেছিলেন চিত্তররঞ্জন তাঁর 'ঈশ্বর' কবিতায়? আমরা এখানে পুরো কবিতাটিই উদ্ধৃত করছি: 'ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,/প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া/আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,/বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!/ জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন, /জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া:/আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,/সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন!/হায়! হায়! মিথ্যা কথা; ঈশ্বর! ঈশ্বর!/করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে:/ঠেলে 'ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর, /ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে।/উর্দ্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর/শতবার প্রতারিত কাঁদি, মনে মনে।'

চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা' প্রকাশিত হয় ১৯০২, মতান্তরে ১৯০৪

সালে। এরও বেশির ভাগ কবিতার বিষয় মানবিক প্রেম। যদিও ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশও ঘটেছে কয়েকটি কবিতায়। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সাগর-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রাকালে সমুদ্রবক্ষে এর কবিতাগুলো লেখার সূত্রপাত। এই পর্বে এসে তাঁর কবিতার ভাব বা বিষয়বস্তুতে লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি এখানে প্রকৃতির বিশালত্বে মুগ্ধ, সম্মোহিত। তার কাছে সমর্পিতচিত্ত হতে আকুল। সমুদ্র এখানে অসীমের প্রতীক হয়ে তাঁকে হাতছানি দেয়, যার মুখোমুখি হয়ে কবির উচ্চারণ: 'আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!...ওগো যন্ত্রী! বাজাও আমারে।' কিংবা, 'হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারি আমার/আজ মোরে লয়ে যাও ওপারে তোমার।' চিত্তরঞ্জন নিজেই তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটির একটি ইংরেজি গদ্যানুবাদ ও শ্রী অরবিন্দ পদ্যানুবাদ করেন।

Songs of the sea নামে অরবিন্দের অনুবাদটি ১৯২৩/২৪ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'অন্তর্যামী'তে (১৯১৪) এসে চিত্তরঞ্জনকে আমরা পাই বৈষ্ণব কবিদের উত্তর-সাধক হিসেবে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা। জীবনের এই পর্ব থেকে বৈষ্ণবোচিত জীবনদর্শনই তাঁর সাহিত্যচর্চা, রাজনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর পরবর্তী ও সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'কিশোর-কিশোরী'তে (১৯১৫) তাঁর একরকম পরিণতি আমরা দেখতে পাই। দেহাতীত, কামগন্ধহীন এক প্রেমের জন্য আকুতি ব্যক্ত হয়েছে এ পর্বের কবিতায়, যেমন:

কাছে কাছে নাই-বা এলে, তফাত থেকে বাসব ভালো
দুটি প্রাণে আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদিম জ্বালো!
এপার থেকে গাইব গান, ওপার থেকে শুনবে বলে;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

এই শেষ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর চিত্তরঞ্জন কাব্যচর্চা প্রায় ছেড়ে দেন এবং রাজনীতি বা দেশের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি যে তাঁর বিরাট পশারের ওকালতি পেশা ত্যাগ করেন (১৯২০) কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে এতদিনের শৌখিনতা ছেড়ে সস্তা ও মোটা খদ্দরের ফতুয়া ও খাটো ধুতি পরতে শুরু করেন, শুধু তাই নয়। তাঁর কলকাতা রসা রোডের পৈতৃক বাড়িটিও এ সময় তিনি লিখিতভাবে জাতির সেবায় দান করেন (পরে যেখানে মহাত্মা গান্ধির উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইতিমধ্যে তাঁর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যপত্র 'নারায়ণ'। তাঁর শেষদিকের রচিত অনেক কবিতা, কিছু গান, দুটি গল্প ('ডালিম' ও 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা') এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও বাংলা অভিভাষণ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নারায়ণে প্রকাশিত এসব প্রবন্ধ ও অভিভাষণে

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যদৃষ্টি ও দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ পায়। এরকম কিছু প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'দেশের কথা' প্রবন্ধ পুস্তকটি। অবশ্য দেশমাতৃকার আহ্বানে তিনি যখন রাজনীতিতে পুরোপুরি আত্মনিবেদিত তখনও তাঁর সাহিত্যপ্রীতি অবলুপ্ত হয়নি। বরং এ বিষয়ে আপন আক্ষেপ ব্যক্ত করে পাটনা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন 'আপনারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ক্ষোভের কোনো কারণ নাই। আমিও সাহিত্যসেবায় জীবনাতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই অবলম্বিত হইত।' (উদ্ধৃত: দেশবন্ধু, রচনাসমগ্র, পৃ.৫)

৩

চিত্তরঞ্জনের প্রিয় লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিশেষ করে 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' বই দুটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তাঁর কন্যা অপর্ণাদেবীর লেখা জীবনী থেকে জানা যায়, পারিবারিক সান্ধ্য সাহিত্য বৈঠকে তিনি প্রায়ই এ দুটি বই থেকে সবাইকে পড়ে শোনাতেন। কমলাকান্তের দপ্তর পড়তে গিয়ে যেখানে বঙ্কিম কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিকস নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো' ইহাই আমাদের পলিটিক্স, তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।' —সে অংশটুকু পড়ে চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য: 'বাঙালি জাতির পরাধীনতার ব্যথা ও ধিক্কার এমনভাবে আর কেউ লেখেনি।' (অপর্ণা: ৬১-৬২) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি এই গভীর অনুরাগ বা শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছিল নারায়ণের একটি বিশেষ বঙ্কিম সংখ্যা বের করার মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর এই প্রীতি বা পক্ষপাত এবং উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে চিত্তরঞ্জনের স্বাজাত্যবোধের স্বরূপ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিরূপতার কারণ অনুমান করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তাঁর প্রিয় অন্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাঁকে যা মুগ্ধ করত তা হল বৈষ্ণব সাহিত্য। কন্যা অপর্ণাদেবীর বক্তব্য অনুযায়ী চিত্তরঞ্জন-পত্নী...বাসন্তীদেবীই প্রথম চিত্তরঞ্জনকে বৈষ্ণব পদাবলির 'রস আস্বাদন করান'। (অপর্ণা:৬৭) পরবর্তীকালে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর মনে এতটাই দৃঢ়মূল হয় যে তা শুধু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিকেই প্রভাবিত করেনি, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন, ঘরের সব বাতি নিভিয়ে তাঁকে 'মাধব বহুত মিনতি করুঁ তোয়' এই বৈষ্ণব পদটি গেয়ে শোনাতে

হত। কন্যা অপর্ণাদেবীকে বলেছিলেন, মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যেন এ গানটি শোনানো হয়। (অপর্ণা: ২৩০) 'বাংলার গীতিকবিতা' নামক তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে চিত্তরঞ্জন দাশ চণ্ডীদাসকেই বাংলার সর্বপ্রধান কবি আর চণ্ডীদাসের কবিতাকেই 'বাংলার যথার্থ গীতিকাব্য' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কী অর্থে তিনি চণ্ডীদাসকে বাংলার যথার্থ গীতিকাব্য রচয়িতা মনে করতেন? তাঁর নিজের ভাষায়, 'এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহাই বাঙ্গালার গীতিকবিতার প্রাণ।' এবং 'যে দেশের কথা চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন, সেই দেশের কাহিনী গানে না ফুটাইলে গানের সার্থকতা কই?'

৪

কবি, গল্পকার কিংবা প্রাবন্ধিক চিত্তররঞ্জন দাশকে বাংলা সাহিত্য তেমন মনে রাখেনি। যদিও একসময় পাঠ্যপুস্তকভুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর 'মোছ আঁখি' ('মোছ আঁখি মনে কর এ বিশ্বসংসার/কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ/রাবণের চিতাসম যদিও আমার/জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন?/অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে...') কিংবা অন্য কোনো কোনো সূত্রে 'ওফিলিয়া'র মতো আরও দু-চারটি কবিতা কমবেশি পাঠক-পরিচিতি লাভ করেছিল। এমনকি শরৎচন্দ্রের মতো লেখকও তাঁর গল্প পড়ে আপন মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জনের উল্লেখ ও আলোচনা প্রধানত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত নারায়ণ পত্রিকা (১৯১৪) ও তাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-বিরোধিতা প্রসঙ্গে। সেকালের প্রায় সব বিশিষ্ট লেখকই নারায়ণের পাতায় লিখতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কালিদাস রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, হেমন্তকুমার সরকার, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যে প্রবলভাবেই উপস্থিত। তাঁর নোবেল জয়ের ঘটনাটিও ততদিনে ঘটে গেছে। (১৯১৩ খ্রি.) কে বড়ো কবি, রবীন্দ্রনাথ নাকি ডি. এল. রায়—অন্তত এ বিতর্ক আর তখন বাংলার সাহিত্যমোদীদের মাতায় না। অথচ জানা যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাই নারায়ণে প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাই নয়, নারায়ণই হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্র-বিরোধিতার অন্যতম বাহন। চিত্তরঞ্জন নিজে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সরাসরি সমালোচনা করে বেশি কিছু লেখেননি। এ ব্যাপারে কাণ্ডারির ভূমিকা নেন আর-এক দেশনেতা, বাগ্মী ও লেখক বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)। আরও পরবর্তী সময়ে (কংগ্রেসের বরিশাল কনফারেন্স ১৯২১) বিপিন পালের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক মতান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটলেও, এই পর্যায়ে বিপিন পালই ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক

গুরু। তাঁদের দুজনের স্বদেশভাবনাই ছিল, সমকালীন অন্য অনেক লেখক-মনীষী-দেশনেতার মতো, কতক পরিমাণে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের আদর্শে সঞ্জীবিত (যদি বাংলা যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দেশ এ সত্যটা তাঁরা দুজনই বরাবর বিশ্বাস করতেন)। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভাবধারার দ্বারা তাঁরা উভয়েই গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। নারায়ণ পত্রিকা ও তাতে বিপিন পালের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

'দাশ সাহেব [চিত্তরঞ্জন দাশ] নিজে সম্পাদক হইয়াও নারায়ণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কথা বলিলেন না। কাহাকেও দিয়া সেকথা লিখাইলেনও না। তিনি শিষ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার গুরু। তিনি গুরুকে দিয়া একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখাইলেন—'নূতনে পুরাতন'। সেই পুরাণ কথা, সেই 'হিন্দু রিভাইভ্যাল, সেই হিন্দু ধর্মের নবজীবন। বঙ্গদর্শনের শেষকালে যাহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল।...দাশ-পালের কাগজে ইহা খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। আমাদের পুরানো যাহা ছিল ভালই ছিল।' (ভূমিকা, দেশবন্ধু, রচনাসমগ্র, ১৩৫৬, পৃ. ২৪)।

নারায়ণের সমসাময়িককালেই, কয়েক মাস আগে, প্রমথ চৌধুরী সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজপত্র'। কী ভাষা কী সাহিত্যাদর্শ সব ব্যাপারেই নারায়ণের অবস্থান ছিল সবুজপত্রের বিপক্ষে। সবুজপত্রের শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি। নারায়ণের প্রথম সংখ্যায়ই প্রকাশিত হয় এই 'স্ত্রীর পত্র'-এর জবাবে লেখা বিপিনচন্দ্রের গল্প 'মৃণালের কথা'। এতে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করা হয়। যা এমনকি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাপারে বিপিন পালের একটি বড়ো অভিযোগ ছিল, তাতে বাস্তবতার অভাব আছে। এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের মূল্যায়নও ছিল বিপিন পালের অনুরূপ। ফলে দুজনের মিল ঘটেছে সহজেই। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যকেই চিত্তরঞ্জনের কাছে খাঁটি বাংলা সাহিত্য বলে মনে হয়েছে। তাঁর 'বাঙ্গালার গীতিকবিতা', 'কবিতার কথা', 'রূপান্তরের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বিশদভাবে তাঁর এই মত ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয়কে মিলাইয়া মিশাইয়া কাব্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।' (বা. গী.) বলা বাহুল্য, এই প্রবণতাটিকে তিনি ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই প্রচেষ্টার সফলতা সম্পর্কে। 'বাঙ্গালার গীতিকবিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যের 'জন্মকথা' কবিতাটি উদ্ধৃত করে চিত্তরঞ্জন লিখেছেন, 'মাতা তাহার সন্তানকে বলিতেছে, 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' কোন খোকা আজও পর্যন্ত 'এলেম আমি কোথা থেকে/কোন খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।' বলিতে পারে কি না জানি না।...আমি যাহাকে ইংরাজী গীতি-কবিতার কথা বলিয়াছি, ইহা সেই বিলাতী ছাঁদে তৈরী।' (দে.র., পৃ. ৫৯)

বাংলার শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি সবকিছুর জন্যই পাশ্চাত্য প্রভাবকে চিত্তরঞ্জন ক্ষতিকর ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাঙালি জীবনের সবকিছুই ভালো ছিল, ব্রিটিশ শাসনের ফলে সবকিছুতেই পচন বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে, তা শিকড়বিচ্ছিন্ন ও বাস্তবসম্পর্কশূন্য হয়ে পড়েছে, এমনই একটি ধারণা পোষণ করতেন তিনি। নারায়ণের ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে লেখা সম্পাদকীয়তে তাঁর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য : 'বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে আমরা স্ব-ভাবে ফিরাইয়া আনিতে চাহি। কৃত্রিমতা ও সর্বপ্রকার পরানুকরণের মোহ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে, আমাদের জীবনকে বিষে বিষে জর জর করিয়া দিয়াছে। বিষ পরিপাক হয় না। পাশ্চাত্যের বিষ আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই এই শ্রেণির সাহিত্য ও জীবনকে আমরা 'নারায়ণ'-এর পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই।' (দে.র.: ২২২) পক্ষান্তরে সাহিত্য-শিল্পে পুরানোর অনুবর্তন, বস্তুতন্ত্র, বিদেশি প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় সমসময়েই, খুব সম্ভব নারায়ণের পাতায় প্রকাশিত মতামতের প্রতি ইঙ্গিত করেই, রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) লিখছেন: '...আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে বহাল থাকবে এ কথা বললে অন্যায় হবে।...আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কী হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। ...নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।...বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশি নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ।...সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেনি।...ইউরোপীয় সভ্যতায় যেসব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে।' না, রবীন্দ্রনাথ এটুকু বলেও থেমে যাননি, আরও এগিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই অধিকার বিস্তারকে একদল নিজেকে হারিয়ে যাওয়া কয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।' (র. র./৯, ১৪১০, পৃ. ৬৩৪) অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, সবুজপত্র-নারায়ণই বলি কিংবা চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ, বিরোধ বা লড়াইটা একতরফা ছিল না। বাদানুবাদ দুদিক থেকেই হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাবিত মুখের ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার যে নীতি সবুজপত্র গ্রহণ করেছিল তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নারায়ণ সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক সাধারণ লেখ্যভাষার প্রস্তাব করে। এ বিষয়ে নারায়ণের বক্তব্য ছিল: 'ভাষা এমন হওয়া চাই, যাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ব্যবহার করিতে পারে।' এ কথার দ্বারা নারায়ণ কার্যত প্রচলিত লেখ্যভাষারই একটি সহজরূপের পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এ সম্পর্কে পত্রিকাটির আষাঢ় ১৩২৪ সংখ্যায় 'একটি মোকদ্দমার রায়, চলতি ভাষা বনাম সাধু ভাষা' নামে যতীন্দ্রমোহন সিংহের একটি রম্য-নিবন্ধ ছাপা হয়, চিত্তরঞ্জন যার 'খুব প্রশংসা' করেছিলেন বলে তাঁর কন্যার লেখা থেকে জানা যায়। (অপর্ণা : ১০২) উক্ত প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষাও যে একরকম নয়, উদাহরণ দিয়ে তা দেখানো হয়। নারায়ণের এই রবীন্দ্র-বিরোধিতার পিছনে স্পষ্টতই চিত্তরঞ্জন দাশের প্রণোদনা ছিল। পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই রবীন্দ্র-সমালোচনামূলক এক বা একাধিক রচনা প্রকাশই তার প্রমাণ। এভাবে পত্রিকার তিন বছরের আয়ুষ্কালে রবীন্দ্র-সমালোচনামূলক অনেকগুলো লেখা নারায়ণে প্রকাশিত হয়। সব সমেত আট বছর টিকেছিল 'নারায়ণ' পত্রিকা। শুধু চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, যতীন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, যদুনাথ সরকারের মতো লেখকরাই যে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় কলম ধরেছেন তা নয়; এমনকি শরৎচন্দ্রও পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩২৮ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের বিরোধিতা করে লেখেন 'শিক্ষার বিরোধ'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।...এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অবিশ্বাস করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।' এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য: 'ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দয়ে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্বিবাদে হজম করতে পারিনে।'

৫

প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা স্পষ্টতই স্বাদেশিকতার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবিকতা বা আন্তর্জাতিকতার, ঈশ্বরচিন্তার পর্যায় অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবপ্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। তাঁর 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা এবং সবুজপত্রে প্রকাশিত 'লড়াইয়ের মূল' (১৩২১) প্রবন্ধ বিশেষভাবে সে পালাবদলের সাক্ষ্য বহন করছে। এ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে একটি সংকীর্ণ ও সভ্যতা-বিধ্বংসী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আমেরিকা সফরকালে সেখানে ন্যাশনালিজম বিষয়ে একটি লিখিত ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের 'কোনো কোনো অংশ' 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ছাপা হলে তা পড়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে :

'এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে।...ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন...। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।'...('বাঙ্গালার কথা', ১৯১৭)।

শুধু জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেই নয়, শিক্ষা, ধর্মচিন্তা, শিল্পনীতি ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ে এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে শিক্ষায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সহযোগ বা আদানপ্রদানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেখানে চিত্তরঞ্জনের অভিমত ছিল: 'বাঙ্গলার মাটিতে, বাঙ্গলার ভাষায় যে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে শিক্ষা বাঙ্গালী তাহার স্বভাবগুণে সহজেই আয়ত্ত করে সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।' এবং 'উচ্চশিক্ষাই হউক, কি নীচুশিক্ষাই হউক, সকল রকমের শিক্ষাকেই বাঙ্গালী জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।...ধার-করা বিজ্ঞানের অহঙ্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।' ('আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা', ১৯১৭)।

ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হয়েও চিত্তরঞ্জন কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কখনও মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। বলা যায় ব্রাহ্মধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বরাবরই একরকম বিরূপতা ছিল তাঁর। আর সেটা তিনি কখনও গোপন করেননি। শুধু যে আপন পুত্র-কন্যাদের তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়, সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করে

বলেছিলেন, বাঙালির ধর্মসাধনার ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম মেলে না। রামমোহন প্রবর্তিত আধুনিকতাও তাঁর মতে উপনিবেশায়িত আধুনিকতা। একাধিক প্রবন্ধে একাধিকবার তিনি তাঁর এ মত ব্যক্ত করেন। যেমন 'বাঙ্গালার গীতিকবিতা' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না।...খ্রিস্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনাকে ভালভাবে উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধন এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।...রামমোহন বাঙ্গলা দেশের ধর্ম্মসাধনাকে বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বাঙ্গালীর গান হইতে পারে না...।' (দে.র., ৬৪ ও ১২২) চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্র-বিরোধিতার পিছনে কি তাঁর সে ব্রাহ্ম-বিরূপতারও কমবেশি ভূমিকা ছিল?

চিত্তরঞ্জন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-বিদ্বেষের অভিযোগ অস্বীকার করেন বলে তাঁর কন্যা চিত্তরঞ্জন জীবনীকার অপর্ণাদেবী আমাদের জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য ছিল : 'কথাটা ঠিক হল না, আমি রবিবিদ্বেষী একেবারেই নই, অলৌকিক প্রতিভা আমি কখনও অস্বীকার করি না, তবে তাঁর সব লেখাই যে ভাল লাগে তা বলতে পারি না।' অর্থাৎ রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাটত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই চিত্তরঞ্জনকে রবীন্দ্র-বিরোধী অবস্থান নিতে প্ররোচিত করে। আর, চিত্তরঞ্জন-কন্যার দাবি অনুযায়ী, নারায়ণে রবীন্দ্র-বিরোধী লেখা ছাপা হওয়ার পরও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যে ঘাটতি পড়েনি। (অপর্ণা: ৬৭) অন্তত দেশব্রতী চিত্তরঞ্জনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের বহু উদ্ধৃত কাব্যপঙ্‌ক্তি দুটি আগেই উল্লেখ্য। (এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।)

কবিরূপে 'তিতাসের' কথাকার

অদ্বৈত মল্লবর্মন এই নামটির সঙ্গে আমরা কোনো না কোনোভাবে পরিচিত। ১৯৬৩ সালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নট, নাট্যকার, পরিচালক উৎপল দত্ত এল.টি.জি-র ব্যানারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটক (মিনার্ভা) মঞ্চস্থ করে প্রায় শত রজনি পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে এক নতুন প্রতিভার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। আবার ১৯৭৩ সালে নতুন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের উৎসাহে ত্রিপুরার গোকর্ণঘাট (যা বর্তমানে বাংলাদেশে)-এর লেখক ও দেশ পত্রিকার প্রাক্তন কর্মী অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রে ধরেন ঋত্বিক ঘটক। যদিও এই উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈতকে সাহিত্যজগতে পরিচিত করেছিল, কিন্তু এর মূল পাঠের সঙ্গে পরবর্তী কালে পুথিঘর প্রকাশিত পাঠের অনেক অমিল দেখতে পাওয়া যায়, যা হোক 'তিতাস' অকালে প্রয়াত সাহিত্যিক অদ্বৈতকে প্রখ্যাত করেছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন অনেকাংশেই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। যদিও দেশ পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষ অদ্বৈতের সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তবুও অদ্বৈতর কিছু গল্প, কিছু অভিভাষণ, মার্কিন লেখিকা পার্ল এস বাকের 'চীনদেশের জীবনকথা'র অদ্বৈত যে দেশ পত্রিকায় অনুবাদ করেছিলেন (এর মূল নাম ছিল 'গুড আর্থ') এবং আরও কিছু কবিতা, যা বাঙালি মাত্রই কিছু না কিছু চর্চা করে থাকে। অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকই শুরুতে বা অবরে-সবরে কবিতা লিখে ও মূলত কথাকার হিসেবে পরিচিত হয়েছেন অদ্বৈতর ভাগ্যে একটি উপন্যাস অনেকটা সেই কীর্তি করেছে।

যাহোক, অদ্বৈত মল্লবর্মনের (১.১.১৯১৪-১৬.৪.১৯৫১) শতবর্ষে তাঁর কবি প্রতিভার কিছু পরিচয় নেবার চেষ্টা করা হবে এই আলোচনায়। একটি উপন্যাসের রচয়িতা অদ্বৈত খান চার-পাঁচেক গল্প এবং গোটা ছয়েক কবিতা লিখেছিলেন। (যেগুলি পাওয়া গেছে)।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'বিদেশী নায়িকা' কবিতাটি কলকাতার আমির আলি অ্যাভিনিউর 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে হেমন্ত সংখ্যায়

মুদ্রিত হয়। এটি গবেষক ড. ইসরাইল খান খুঁজে পেয়েছেন। ড. খানই আবার আর-একটি কবিতা 'মাসিক মোহাম্মদী'র অগ্রহায়ণ ১৩৫২-এ প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন, কবিতাটি হল 'শুশুক'। 'মোদের রাজা মোদের রাণী' নামক অদ্বৈতের একটি কবিতা ১৯৯৬ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'সংবাদ সাময়িকী' পত্রিকার অদ্বৈত মল্লবর্মন ও তাঁর কবিতা নামক লেখায় উল্লেখ করেন। লেখাটির লেখক তিতাস চৌধুরী। সম্ভবত, ১৯৩৫ সাল নাগাদ এটি লেখা হয়েছিল। 'যোদ্ধার গান' নামক আর-একটি কবিতা সম্ভবত, 'মাসিক মোহাম্মদীর' বৈশাখ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে বেরিয়েছিল। 'ভাসমান' নামক সংকলনে নির্দেশ ছাড়াই 'বৈশাখ ১৩৫২' বলে ছাপানো হয়েছে। 'ধারা শ্রাবণ' নামীয় আর-একটি কবিতাও উপরোক্ত তিতাস চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত লেখায় গ্রহণ করেছেন। এই কবিতার প্রথম উৎস জানা নেই। 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' নামীয় কবিতাটি তিতাস চৌধুরীই সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতে এই কবিতা ১৩৪২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ তথা ১৯৩৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে লেখা বলে জানিয়েছেন। এই সমস্ত সূত্রগুলির উৎস 'চতুর্থ দুনিয়া'—অদ্বৈত মল্লবর্মন সংখ্যায় লেখক অচিন্ত্য বিশ্বাসের। আবার ওঁরই সম্পাদনায় দে'জ পাবলিসিং থেকে প্রথম প্রকাশন জানুয়ারি ২০০০ সাল, মাঘ ১৪০৬—'অদ্বৈত মল্লবর্মন রচনা সমগ্র'-তে গৃহীত হয়েছে। অদ্বৈতর আর-কোনো লেখা আছে কিনা তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব অদ্বৈতের 'বিদেশী নায়িকা' কবিতা নিয়ে। এটি একটি কাল্পনিক নায়িকাকেন্দ্রিক, যাকে সৃষ্টিকর্তা তিন তিন বারে তিলোত্তমা রূপে তৈরি করেছেন আবার অকালমৃত্যুর দিকে টেনে দিয়েছেন এবং বিখ্যাতও করেছেন জনমানসে। অপরূপা নায়িকার প্রেমে আপামর জনসমাজের সে চির-আকাঙ্ক্ষিত। তার রূপবর্ণনায় কেউ ক্লান্ত হয় না। যদিও কবির কথায় আজ থেকে দুশো বছর আগে তার জন্ম, অকালমৃত্যু তাকে করে রেখে গেছে চির-নবীনা। এই কবিতায় সামান্য হলেও রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতার ছায়া পাওয়া যেতে পারে। 'শুশুক' কবিতাটি একটি জলচর প্রাণীকে নিয়ে পশু বিষয়ক কবিতা। খুবই সহজ সাধারণ বর্ণনায় কবি অদ্বৈত এই জলচর প্রাণীর দৈনন্দিন চলাফেরার রেখাচিত্র দিয়েছেন। ('মহেশ' ও 'কালাপাহাড়' গল্পদুটি মনে পড়ায়।)

'মোদের রাজা মোদের রাণী' কবিতায় অদ্বৈত দেশের শাসক রাজাকে সন্তানের পিতা ও রানিকে স্নেহময়ী মা রূপে চিহ্নিত করেছেন। বাবা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, এখানে রাজা ও রানিও প্রজাদের সেরকমভাবেই স্নেহ করেন। প্রজারূপী সন্তানদের সুখদুঃখের সমান ভাগীদার রাজা ও রানি। সন্তান যেমন কোনো ব্যথা পেলে মায়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে আশীর্বাদ চায়, মনের শান্তি খোঁজে। এই কবিতায় রাজা ও রানি এতই স্নেহশীল যে, প্রজারূপী সন্তানরা তাদের দুঃখব্যথা ভুলে যায় রাজা ও রানিকে স্মরণ করে। রাজা যদিও প্রজাশাসন করেন, কিন্তু অসীম করুণাময়ী রানি তাঁর

সকল স্নেহমমতা দিয়ে প্রজাদের সকল দুঃখ শোক মোচন করেন। প্রজারা তাই সমস্বরে রাজা ও রানির জয়ধ্বনি দিয়েছে। মনে হয় এই কবিতায় তখনকার স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরার রাজা-রানির চিত্রই ফুটে উঠেছে। এটি কিছুটা দীর্ঘ কবিতা। 'যোদ্ধার গান' কবিতাটিও কিছুটা প্রতীকী ঢংয়ে সাধারণ জীবনযোদ্ধার কথাই তুলে ধরেছে। এইরকম যোদ্ধা আমরা সবসময়ই দেখতে অভ্যস্ত। 'ধারা শ্রাবণ' নাতিদীর্ঘ একটি প্রকৃতি বিষয়ক বিশেষত বর্ষা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। কবিতার চিত্রকল্প সাধারণ হলেও তা 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে।' 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' উত্তর-পূর্বের ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানকার অধিবাসী স্বয়ং কবি, সেখানকার দুঃখ, দুর্দশা, অনশন, অর্ধানশন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবনে আশা, অসন, বসনের মূর্তিমতী লক্ষ্মীর আবাহন করেছেন। কারণ তবেই ওই সমস্ত জীবন আবার নবরূপে জেগে উঠবে। তাই জননী ত্রিপুরা লক্ষীর কাছে কবির কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন ওদের আহ্বানে সাড়া দেন। এই কটি কবিতা নিয়েই আপাতত অদ্বৈত মল্লবর্মনের কবিতা যাত্রা, যা হোক কবি হিসেবে বিরাট কিছু না হলেও অদ্বৈত যে শুধু কল্পনাবিলাসী নন, কবি হিসেবে মানবদরদি তা-ও ফুটে উঠেছে। আপাতত এখানেই কবি অদ্বৈত মল্লবর্মনের সম্পর্কীয় এই আলোচনা ক্ষান্ত হবে, ভবিষ্যতে আরও কিছু লেখা পাওয়া গেলে আলোচনা বাড়তে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য

শতবর্ষে পদার্পণ বলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ নয়। লেখার কারণ অন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত বড়োদের জন্যই কলম ধরেছিলেন। কিন্তু ছোটোদের নিয়ে লেখা মানিকের পরিচয় আমরা তেমনভাবে পাই না। যদিও মানিক এক অসমাপ্ত কিশোর উপন্যাস 'মশাল'-এর ভূমিকায় লিখেছেন—'আমি বড়দের জন্য গল্প উপন্যাস লিখছি কুড়ি বাইশ বছর। কিন্তু শিশু আর কিশোরদের একেবারে অবহেলা করেছি এ অভিযোগ মানতে পারবো না। ছোটদের নানা কাগজে অনেক গল্প লিখেছি।' কিন্তু এই সমস্ত গল্পের সবগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মানিকের কিশোর রচনার দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'কিশোর বিচিত্রা'। দাম : চার টাকা। ভূমিকা বিশ্বনাথ দে-র। মানিকের কিশোর উপন্যাস 'মাঝির ছেলে' এবং কিশোরদের জন্য লেখা গল্প—'আমার কান্না', 'চণ্ডীচরণের গান', 'অলৌকিক লৌকিকতা', 'অসহযোগী' 'তৈলচিত্রের ভূত' অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পগুলি 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থেও ছিল। কিশোর বিচিত্রায় নতুন যোগ হয় 'বড় হওয়ার দায়', 'সনাতনী', 'কাণ্ডকারখানা' এবং 'পোড়া ছায়া' নামের ছোটোদের গল্প। মানিক-গ্রন্থপঞ্জির লেখক সরোজ দত্ত বলেছেন যে 'কিশোর বিচিত্রা'-র প্রথম সংস্করণে 'সিদ্ধপুরুষ' গল্পটাও ছিল।

মানিকের কিশোর গল্প বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'আমার কান্না', 'বড় হওয়ার দায়' বা 'অলৌকিক লৌকিকতা' লেখকের স্মৃতিকথা ধরনের রচনা। 'চণ্ডীচরণের গান' নানারকম বিপর্যয়ের বেড়া ডিঙিয়ে চণ্ডীচরণ নামীয় বালকের গান শেখার ব্যর্থ প্রয়াসের করুণ কাহিনি। 'তৈলচিত্রের ভূত' বৈদ্যুতিক কারসাজির মাধ্যমে একটি অলৌকিক প্রাণান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টির গল্প। 'পোড়া ছায়া' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া একটি পরিবারের অশরীরী ছায়ার অস্তিত্ব দেখে ভয় পাওয়ার অতি সাধারণ বর্ণনার ভৌতিক গল্প 'ভয় দেখানোর গল্প' দুই বন্ধুর পারস্পরিক ভয় দেখানোর বিষাদাত্মক বিবরণ 'শৈশবস্মৃতি যাচাই করার গল্প'-তে লেখকের উদ্ভট খেয়ালিপনার ছাপ, এই গল্পটি কিছুতেই কিশোর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত

হওয়া উচিত হয়। 'গল্প চুরির গল্পে' তরুণ লেখকদের সম্পর্কে মাণিকের নির্দেশাত্মক বক্তব্য বা 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্পে' তিনজন আপাত সাহসী ছেলের হৃদয়দৌর্বল্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। তবে 'টিকিট নেই' গল্পটি ছোটোদের মনোহরণের উপযোগী গল্প। এখানে বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ করার কৌশলে রীতিমতো পারদর্শী মায়াধর একদা কী সুকৌশলে জনবহুল হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে টিকিট-চেকারের চোখে ধুলো দিয়ে জন পনেরো ওড়িয়া নরনারীকে মুক্ত করে এনেছিল তার সরস বাস্তব বর্ণনা। 'পাশফেল' কিশোর সংকলকের গল্প হলেও বড়োদের উপযোগী গল্প। নীরেনের আত্মহত্যা গল্পের মূল বিষয়বস্তু। পাশ করেও আর পড়তে না পারার যন্ত্রণায় সে বিষ খায়। খবরের কাগজে সেই খবর বেরিয়েছে। মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে জীর্ণ, ক্ষুধার্ত,...শিশুদের মধ্যেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজেছেন মানিক। তাই তাঁর উক্তি—'ছোট ছোট চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণের চোখের কথা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন। সাত বছরের ক্ষুধার্ত শিশু যখন তার মায়ের মুখের উপর তীব্র জ্বালায় ফেটে পড়ে তখন মানিক সরাসরি পাঠকের সামনে আবির্ভূত হন—'হে রাত আটটায় তারায় ভরা আকাশ। একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে।'

এ ছাড়া 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' বিকারগ্রস্ত সূর্যবাবুর ভিটামিন খাওয়ার খুঁতখুঁতে স্বভাবের স্বল্প। ভিটামিনের অভাবে তাঁর শরীর খারাপ হয়। ডাক্তারের কথা শুনে সূর্যবাবু নানা বই পড়ে ভিটামিন সম্বন্ধে জানেন। বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারে সবাইকে নাজেহাল করেন। কিন্তু তাতেও তাঁর শরীর সারে না, নিক্তি মেপে ভিটামিন বের করেও কোনো কূলকিনারা হয় না। আবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তারের উপদেশ বেড়ানো পর্যন্ত বাদ দিয়ে সারাদিন ঘরে বসে থাকলে সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা মিটবে না। সূর্যবাবু পথ পেয়ে গেলেন।

'অসহযোগী' গল্পের মূল চরিত্র হর্ষনাথের ছেলে রমেন। ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার হর্ষনাথ। ছেলেবয়সে রমেন দুর্দান্ত দুরন্ত ও দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। ছেলের জন্য হর্ষনাথকে কোর্টঘর পর্যন্ত করতে হয়। চমৎকার গল্প এটি।

'দাড়ির গল্প' ও এক সুন্দর রূপকথা। ঠাকুরদা গল্প বলছেন নাতি-নাতনির কাছে, মা-মাসি-বাবা-কাকারাও না-শোনার ভান করে বেশ মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছে। ভূতের গল্প নয়। এক প্রকাণ্ড দৈত্যের দাড়ির জঙ্গলে রাজকন্যার হারিয়ে যাওয়ার গল্প। চিলড্রেন ফ্যানটাসি-র উপযোগী রচনা। অবশেষে আকাশের মেঘ কাটে। কাঁচি চেয়ে নিয়ে এসে রাজপুত আর মন্ত্রীপুত দৈত্যের দাড়ি কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল তেপান্তরের মাঠে। অনেক কষ্টে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে দুই বন্ধু দেশে ফিরে এল। তারপর ঠাকুরদা কানাই নামক বালককে বললেন যে তাঁর দাড়ির মধ্যেও লুকিয়ে

আছে হাসিপুরের রাজকন্যা। তার পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল যে, ঠাকুরদার অতি সাধের দাড়ি কে রাতেরবেলায় কেটে নিয়েছে। ভালো গল্প বলার আনন্দের চেয়ে এখন দাড়ি যাওয়ার দুঃখই ঠাকুরদার বেশি বোধ হয়েছে। অনাবিল নির্মল হাসির গল্প এটি। 'ম্যাজিক' মানিকের পারিবারিক ঘটনার চিত্ররূপ। হারানো ছুরি খুঁজে পাওয়ার এক সুন্দর গল্প। মানুষের সব দিক খুব সোজা দিক পর্যন্ত খেয়াল হয় না বলেই ম্যাজিক সম্ভব হয়েছে। 'কোথায় গেল' এক ভদ্রলোকের অন্যমনস্কতার সুন্দর গল্পরূপ এবং 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা' দুই বন্ধুর একে অন্যকে জব্দ করার পরিণাম কী ভয়ংকর হয়েছে তার গল্প।

'এলো' বিমানের পুরোনো হারানো সঙ্গী গোরাকে স্বপ্নে দেখার সুন্দর গল্প। পুরোনো বন্ধুর জন্য বিমানের কী গভীর দরদ, অনেকদিন পর নিজের বাসায় ফিরে আসার পর তাদের হিম-ঔদাসীন্য কী ব্যথা দেয় বিমানের মনে গোরা, গোরার বাবা-মা কেউ তা বুঝতে পারে না। বালক বয়সের উষ্ণ বন্ধুত্বের চমৎকার গল্প এটি।

'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু' গল্পে এককালে বড়োলোক বাপের গরিব ছেলে কী করে ছ্যাঁচড়ামি করে বড়োলোক হওয়ার মিথ্যা স্বপ্ন দেখে তার কাহিনি। মহাদেও সমরেশের ছাপাখানায় কাজ করে। কিন্তু সমরেশ তাকে বিনে মাইনেয় তিন মাস খাটায়। মহাদেও কোনো সুযোগে সমরেশের কাছে থেকে দশ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যাকে পাওনা পয়সা না দিয়ে খাটানোর পরিকল্পনা ছিল সে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। 'কাণ্ডকারখানা' মানুষের বিবেকবোধের অদ্ভুত গল্প। ফুলগাছটা পেয়েও মালিক জনসন পুরস্কার দেওয়ার প্রত্যাশিত ভঙ্গি করে গোকুলকে পুলিশে দেওয়ার চেষ্টা করেন। 'ভীরু' গল্পের মূল কাহিনি দীনেশবাবু কী করে মুমূর্ষু ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার কিছুদিনের অ্যাক্সিডেন্টের ভয় থেকে অব্যাহতি পেলেন তারই এক চমৎকার বর্ণনা। দুর্ঘটনা দেখে দীনেশবাবু সাময়িক সাহস হারালেও আবার সাহস ফিরে পেয়েছিলেন। দুনিয়ায় অবস্থা বিশেষে ভীরু মানুষ যে আসলে সাহসী হতে পারেন এটা সেই মানুষেরই গল্প।

'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পটি আরম্ভ হয় অলৌকিতা দিয়ে কিন্তু শেষ হয় মানবিকতায়। অন্য লেখকের হাতে হয়তো জটি বুড়ি হত, কিন্তু মানিকের কলমে সেই তিন বুড়ি জীবনের করুণরসে সিক্ত। লেখকের কথায়—'তাদের প্রতি আমার ভয় বা ঘৃণা জাগে না, জাগে সহানুভূতি।' এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।

'মশাল'-এর মতোই 'মাটির কাছের কিশোর কবি' মানিকের আর-এক অসমাপ্ত কিশোর উপন্যাস, অসমাপ্ত এই উপন্যাসটি মানিকের মৃত্যুর পর শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পূর্ণ করে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'আগামী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই উপন্যাসের নাম দেখে স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্মরণে আসে কবি সুকান্তের

কথা। মাত্র একুশ বছর বয়সে যার জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও মানিক নিজে মুখে সে-কথা স্বীকার করেনি।

বাস্তবিক উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে কিশোর নামে একটি বালককে কেন্দ্র করে। তার ছিল অদ্ভুত তেজ, জিদ আর ধারালো বুদ্ধি। অনেকেই অবশ্য তাকে মনে করত বোকা হাবা। কিশোরের ছোটোবেলা থেকেই খাতির গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে। তার আর-একটা দিক ছিল নালিশ আর আপশোশের দিক—রাগ আর ক্ষোভের দিক। ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে কত নালিশ জমে উঠেছে। চারিদিকে দারিদ্র্যও মানুষের সৃষ্টি। কিশোর আরও জানে—'মানুষই মানুষের এ দশা করেছে। সমাজ না বদলালে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।'

উপন্যাসটি এককথায় চমৎকার। অন্যান্য লেখকদের মতো মানিক শিশুসাহিত্য রচনায় উদ্ভট কাহিনি বা কল্পনার ফানুসকে উত্তাল উড্ডীন করেননি।

১৯৫৮ সালের জুন মাসে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির নামক প্রকাশনা সংস্থা শিশু কিশোরদের জন্য লেখা ১২টি গল্প নিয়ে প্রকাশ করে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'। গ্রন্থটির কত দাম ছিল তা জানা যায় না। গল্পগুলি হল—'ভয় দেখানোর গল্প', 'শৈশব স্মৃতি যাচাইয়ের গল্প', 'তৈলচিত্রের ভূত', 'টিকিট নেই', 'অসহযোগী', 'চণ্ডীচরণের গান', 'অলৌকিক লৌকিকতা', 'পাশফেল', 'আমার কান্না'।

মানিকের অগ্রন্থিত ছোটোদের গল্প 'ভীরু', 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৫.০৯.৫০ সালে প্রকাশিত। 'ভূতের গল্প' 'মৌচাকে' ০৬.০৭.৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'ছবির ভূত' 'মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮) অন্তর্ভুক্ত একটি গল্পের নাম 'তৈলচিত্রের ভূত'—'ছবির ভূত' 'ঠাকুমার গোঁসা'—'আগামী' কি উক্ত গল্পের আদি নাম। (দ্বিতীয় বর্ষ শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ)

'দু-আনা আর দু-পয়সা' 'মৌচাক' মাঘ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত লেখকের একটি গল্পের নাম 'নীচু চোখে-দু আনা আর দু পয়সা'—গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়ে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার শ্রাবণ-১৩৫৫ সংখ্যায়। 'মৌচাক'-এ প্রকাশিত বর্তমান গল্পটি উল্লিখিত গল্পের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত রূপ।

ছোটোদের মতো করে লেখা।

'পুরস্কার' 'আগামী' প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ প্রকাশিত। 'টেলিগ্রাম' গল্পটি শারদীয়া 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত, এ পর্যন্ত মানিকের ছোটোদের গল্প-উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া গেল। আরও ছোটোদের জন্য লেখা থেকে যেতে পারে যা আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

কবি বনফুল

'মনন' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা সাহিত্য' শিরোনাম রচনায় বনফুল সম্ভবত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন—'সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে বাংলা কবিতা ও নাটকের মান কিন্তু অনেক নামিয়া গিয়াছে। গদ্য কবিতা বলিয়া যাহা মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তাহা কবিতা নয়, "অদ্ভুত হেঁয়ালি মাত্র"।' এই স্বীকারোক্তি থেকে বনফুলের কবিতা লেখার ভাবনা কিছু বোঝা যায়। আন্তন চেকভ লিখেছিলেন—'Medicine is my lawful wife and literature is my mistreess. When I get tired of one, I spend the night with the other'। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্বের কথা লেখা না থাকলেও পরকীয়া ডার্লিং সাহিত্যই চেকভকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। চেকভ গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখায় বিচরণ করলেও বনফুল শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখা, যেমন বিভিন্ন রীতির নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এমনকি শেষজীবনে ছবিও এঁকেছেন।

বিশিষ্ট সমালোচক ড. সুকুমার সেন তো আর একধাপ এগিয়ে তাঁর 'বনফুলের ফুলবন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—'তাই বনফুলের রচনায় যে বিচিত্রতার সম্ভার পাই তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় পাই না।' আর সাহিত্যক্ষেত্রে বনফুল কবিতা রচনা স্কুলজীবনেই শুরু করেছিলেন। শেষজীবন পর্যন্ত গদ্য ও কবিতা একত্রে কথাসাহিত্যে প্রয়োগ করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দকে উৎসর্গ করে বনফুলের 'নিখুঁতদর্পণ' কবিতা, 'কালো মেয়েটি' বা 'বঙ্গবিহার পুনর্মিলন প্রসঙ্গে কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যবহার। 'রবীন্দ্রনাথের আত্মসম্মান' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতায়। বাংলা ছোটো গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর অবদান যতটা আলোচিত কবিসত্তা বা কবিতা ততটা আলোকিত প্রকাশ পায়নি। তিরিশ দশকের কবিদের বহুমাত্রিক শব্দ ব্যবহারের ঔজ্জ্বল্য বাংলা কাব্য-কবিতায় নতুন মাত্রা এনেছিল। কবি কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বনফুল একমাত্রিকতা ছেড়ে বহুমাত্রিকতার চর্চা করেছেন।

রাতে যবে শুয়ে থাকি সুকোমল শয়নে
ঘুমে যবে ঢুলে পড়ে ধীরে দুটি নয়নে,
স্বপ্ন সায়রে যবে ডুব-ডুব চেতনা,
পাশরি যেতেছি যবে দিবসের বেদনা,
তুমি তবে চুপি চুপি কোথা হতে আসিয়া,
সাধের সে ঘুমঘোর দাও ক্ষণে নাশিয়া? (ছারপোকা)

আবার অন্য একটি কবিতায়—

আমার কবিতা আজি স্তুতিগান করিবে তোমার
হে আমার প্রিয়া,
শতছন্দে গন্ধে বর্ণে আনন্দের অনিন্দ্য আরতি
দিবে বিরচিয়া।
দেহ তারে অনুমতি অতীন্দ্রিয় লোক হতে সখি
নেমে এস ধীরে
মুখরিত বর্ণনার ছন্দবর্ণ বিচ্ছুরিত
ভাষাময় তীরে। (প্রেমের কবিতা)

কবি বনফুল উপরোক্ত প্রথম কবিতায় 'শয়নে' এর সঙ্গে 'নয়নে'-র মিল দেওয়ার যে প্রবলেচ্ছা ব্যবহার করেছেন তা কবির স্বাধীনতা হলেও বাক্যগঠনে স্বাভাবিক রীতিকে ব্যাহত করেছে। আবার পরের কবিতায় 'দিবে বিরচিয়া'র মতো শব্দবন্ধ রবীন্দ্র-প্রভাবকে মনে পড়ায়।

বনফুল অজস্র প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতা সংকলন 'সুরসপ্তক'-এ প্রেমের কবিতার দুটি গুচ্ছ গৃহীত। প্রথম গুচ্ছে শিরোনামহীন ৭২টি কবিতা, দ্বিতীয় গুচ্ছে 'কৃষ্ণা' নামাঙ্কিত ১৪টি এবং 'শুক্লা'-তে আরও ১৪টি অর্থাৎ মোট ১০০টি প্রেমের কবিতায় চিরকালীন মান অভিমান, সংশয়, দ্বিধা, বেদনা, আনন্দ সমস্ত কিছু চিত্রিত হয়েছে, কখনও প্রিয়ার ভুবনভোলানো হাসির জ্যোৎস্না, মায়া মাখানো চোখের ভাষা তাঁকে আত্মহারা করেছে, কখনও তার খসে পড়া বেণি বা মেখলা তাঁকে দিয়েছে কুসুমবৃষ্টিতে অবগাহনের আনন্দ। শিরোনামহীন প্রথম গুচ্ছের ৪১ সংখ্যক কবিতা—

'এসেছ যদি প্রিয়া
আঁচল আকুলিয়া
অমন তবে আধেক পথে
থেকো না থমকিয়া
সহজতালে চরণ ফেলি ভুলিয়া ভাবা বোঝা
নিরালা মম জীবন মাঝে চলিয়া এস সোজা
উঠো না চমকিয়া।

আসিলে তুমি ফুটিবে ফুল গাহিবে মোর পাখী
আকাশে মোর উঠিবে চাঁদ ভুলিয়া গেছ তা কি?
থেকো না সরমিয়া।
সরমে যদি সরিয়া থাক আনত আঁখি করি
কে তবে মোর বীণার তার সুরেতে দিবে ভরি
গজলে গমকিয়া।

এসেছ যদি প্রিয়া
অমন তবে আধেক পথে,
থেকো না থমকিয়া।

আলোচ্য কবিতায়ও রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষণীয়। এই কবিতাটিকে একটি চমৎকার ভালোবাসার কবিতা বলা যেতে পারে। অন্ত্যমিল ছন্দতরঙ্গে কবিতার বাণীরূপ যেন নৃত্যরত। কালের প্রভাবে এই জাতীয় কবিতা প্রকৃত সমাদর লাভ করেনি।

আবার নিম্নোক্ত কবিতায় পাই—

'আমরা রহি যে মরণ খেলায়
রাবণে কংসে নাশিতে
ভরি কারাগার, ফাঁসির মঞ্চে
উঠি যে হাসিতে হাসিতে
দস্যু নাদির চেংগিস তৈমুর
হিংস্র শ্বাপদ, বিষধর গোক্ষুর
যাহারা তাদের দন্ত করেছে চুর
তাদেরই ভস্মরাশিতে
জনম লভেছি মরণোন্মুখ
নূতন পিশাচে নাশিতে। (আমরা সবাই মরিনি)

এই কবিতার ছন্দবন্ধ ও ভাষাব্যবহার সমকালীন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মনে করায়। বিদ্রোহী কবির প্রভাব সমকালীন বাংলা সাহিত্যে খানিক হলেও পড়েছিল। কবি বনফুল সবচেয়ে বেশি সার্থক তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায়, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও বা প্রবলভাবে লিখিত সেই কবিতাগুলি। এই বিদ্রুপাত্মক কবিতাগুলি আজও অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক। যেমন—

'এ বাজারে শোনা যায় যাঁর হাঁক ডাক,
জগঝম্প বীর তিনি স্কন্ধে জয়ঢাক। (এ বাজারে)
নিজের ঢাক নিজে পেটানোর কথাই আছে এখানে,
আবার, মোটা চায় তন্বীকে মুটি চায় সুঁটকো
আইনত হয় হোক, নয় হোক উটকো।

ভাষার কি খেল দেখ দুজনকে ধরিয়া
বেঁধে দিল একসাথে 'মোটামুটি' করিয়া। (মোটামুটি)

এই সহজ কবিতা, ছড়া আমাদের সুকুমার রায়কে মনে পড়াতে পারে।

অন্যদিকে, রঞ্জাবতী শাড়ি পরে ঝঞ্ঝাবতী সেন
ট্যাক্সি করে ছুটে গিয়ে ধরিলেন প্লেন।
ফিরিলেন যবে তিনি গামছা সম্বল
প্রায় নগ্ন শিখা যেন—অবাক দমকল। (ছররা-২)

এ উক্তির পরিহাস রস সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি হালকা চালের কবিতাকে মনে করাতে পারে।

এমনই দেখা যায়:

দুই ফুট বামনের সাতফুট ভার্যা
পাঁচফুট কম হয় গণিতের আর্যা।
বামন কহিল হাসি, হইলই কম বা
বাজারে মিলিবে মই পাঁচফুট লম্বা। (ছররা-৪)

এইসব কবিতায় সত্যিকে তীক্ষ্ণভাবে না বলে, হাসির মোড়কে মুড়ে উপহার দিয়েছেন কবি বনফুল।

তিলকে করিতে তাল ব্যস্ত নিখিল
তাল তবু তালই থাকে তিল থাকে তিল। (ছররা-৫)

জীবনের জটিলতাকে এইসব ছন্দভঙ্গে সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন বনফুল। 'শনিবারের চিঠি'-তে বনফুলের অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল 'রবিবারের লাঠি'-তেও। তবে কোনো কোনো কবিতায় প্রত্যক্ষ আঘাতের মাধ্যমেও বিদ্রূপকে বাজিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন 'মীরজাফর'-এ।

হে দেশের সুসন্তান, প্রণমি তোমারে।
অন্ধ চোখে বারবার জ্বালিয়াছ আলো,
বারবার বুঝায়েছ যাহা কিছু ভালো
মিথ্যার মুখোশ তাহা; মুখোশের পারে
যাহা সত্য তাহা রহে অকুণ্ঠিত দ্যুতি
লোলজিহ্ব; লালায়িত প্রলুব্ধ আকুতি।
মহাকাল পাদুকা প্রহারে আজ তুমি
জর্জরিত হায়, নাকমুখ চোখকান
ছিন্নভিন্ন মাংসপিণ্ড সম, অবসান
সকল গৌরব, তবু আমি তব পদ চুমি।
সর্বমোহ করিয়াছ মন্ত্রবলে দূর

সপ্রমাণ করিয়াছ সর্পত্ব রজ্জুর।
জ্ঞানাঞ্জন শলাকার, হে নব ধারক,
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, বন্ধু হন্তারক।

সাধুভাষাশ্রয়ী উচ্চারণে মূলত অসাধু বন্ধু হন্তারকের মুখোশপ্রিয়াকে আঘাত করার জন্য এ এক ছদ্মশালীনতার আবরণ। কিছুটা রেখে-ঢেকে উচ্চারণ করলেও আসলে বিদ্রূপের জ্বালা সৃষ্টিই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কবিতায় মোহিতলালের 'কালাপাহাড়' কবিতার কিছু ছায়া পাওয়া যায়। এই কবিতা 'যষ্টিমধু'তে প্রকাশিত।

অনেক সৃজনশীল কবি, লেখক অনেক সময় রূঢ় সমালোচকের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় এর উদাহরণ রেখেছেন 'কণিকা'-র কবিতায়। ইংরেজিতে শেলি সমালোচকদের 'Lemon squizer' নামে অভিহিত করেছেন। কবি বনফুল তাঁর 'ওগো সমালোচক' কবিতায় সমালোচকের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন—

কে তুমি ধরিয়া আছ কাব্যের নিক্তি
গন্ধ মাপিছ বসি জ্বালাইয়া ধূপকে
দুলটির চিকিমিকি, সন্ধ্যার স্বর্ণ
শ্যামলী মেয়ের চোখে স্বপ্নের বর্ণ
কলকোলাহলে ভরা রাজধানী মত্ত
রসালের স্মৃতিবহ 'শুখা' আমসত্ত্ব
গহন নিশীথরাতে গাঢ় নিশ্চুপকে
কোন চোখ, মন দিয়ে
কোন বাটখারা দিয়ে
ওজন করিবে বল এতগুলি রূপকে।

উপমা ব্যবহারে স্বভাবোক্তি লক্ষণীয়। বিদ্রুপের মোড়কে শেল ছুড়েছেন কবি। কবি ঈশ্বর গুপ্তকে মনে পড়তে পারে।

Satire-ধর্মী আর-একটি কবিতা 'শকুনি'—

ভাবে ডাক্তার অসুখে কখন পড়িবে কেবা,
উকিল ভাবিছে করিব কখন আইনসেবা,
দোতালার ছাদে দাঁড়ায়ে ভাবিছে গণিকা যেবা
—কামিনী, রেবা,
দুয়ারে কখন নড়িবে কড়া
উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
রঙে ও চঙেতে ঢলিয়া পড়িছে প্রবীণাবুড়ি,
মদের দোকানে গান্ধীর ছবি টাঙায় শুঁড়ি।
অন্যায় যাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,

শোণিতের স্রোতে ভেসে গেল কত উচ্চ শির।
দর্জির মতো বসে আছে কবি কাব্যকলে
ফরমাস মতো কবিতা ফতুয়া বানায়ে চলে।
সবারই গলায় ফাঁসির দড়া
অট্টহাসিয়া মহাকাল বলে সবাই শকুনি সবাই মড়া।

দেশের সার্বিক ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে নিদারুণ তিক্ততা ফুটে উঠেছে। এখানে আশাবাদীর কণ্ঠে বেদনার সুর ধ্বনিত হয়।

অন্যদিকে শকুন অবলম্বন করে জীবনানন্দ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে 'শকুন' নামক একটি আশ্চর্য মর্মভেদী কবিতা লিখেছেন।

আবার এই বনফুলই শিলচরের বরাক ভাষা শহিদদের স্মরণে একটি অসামান্য কবিতা লিখেছেন—

জলবৎ নহে রক্ত, রক্ত ঘন, রক্ত গাঢ় লাল।
দিবসের উদ্বোধন করে ঊষা রক্তাম্বর সাজে,
মহারাত্রি নেমে আসে গাঢ় রক্ত সন্ধ্যামেঘ মাঝে;
ব্যথার সমুদ্রতলে জন্ম লভে রক্তের প্রবাল
জলবৎ নহে রক্ত, রক্ত ঘন, রক্ত গাঢ় লাল।
....
মহত্ত্বের ইতিহাস লেখা হয় রক্তের সাক্ষরে।
মেদিনীরে সিক্ত করি রক্ত তারে সম্মানিত করে।
রক্তবাণী লেখা থাকে চিরন্তন কালের সূচীতে।
সপ্তসিন্ধুর জল রক্তচিহ্ন পারে না মুছিতে। (রক্ত)

১৯৬১ সালের বাংলা ভাষা শহিদদের স্মৃতিতে এক আশ্চর্য কবিতা।

নাটক-উপন্যাসেও বনফুল যথেচ্ছ কবিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁর প্রথম 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসে।

এ কি মিছে কথা! হয়তো বা তাই—বলো না তবু,
ভেঙো না সে ভুল—ভেঙো না, এ ভুল অনেক দামী,
হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙোনা কভু,
ভেঙো না, ভেঙো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি।

'ডানা' বনফুলের গদ্যপদ্যময় চম্পূরচনা।

সেখানে কবি আনন্দ মোহন তরফদার অনেক কবিতা লিখেছেন। সংখ্যায় প্রায় শ-খানেক (কিছু কম)।

পৃষ্ঠা/পাখি

৩২। কও না কথা, কও না কথা | ১৫৫ হলদে পাখি
৩৩। ওকি ওকি ও | ১৫৮ বেনে বউ
৩৪। একটা ঘরে দুপুর বেলায় | ১৭৮ নানাপাখি
৩৫। তোমাকে চিনি.../ আমাদের তুমি চিনতে দাও / কি ও পাখিওলা | ২৩৫
৩৬। প্যাঁচা দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর বিলাস | ২৪৭৬
৩৭। ওরে তোরা চুপ কর | ২৬৩
৩৮। আমার মনের ভুলগুলি / শুধরে দিল বুলবুলি | ২৬৫ বুলবুলি
৩৯। বৈশাখী দুপুরের নিদারুণ আলোতে | ২৭৪
৪০। যা আছি তাই থাক | ২৮৮
৪১। দরজি পাখি শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলে | ৩২৪
৪২। সমাজ মানে আঁধার গলি | ৩৩৯ দুধরাজ
৪৩। খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই | ৩৪৭
৪৪। শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী | ৩৫৮ অনেক পাখি
৪৫। ওরে ভুতো/ পাখিগুলো তাড়াতাড়া, মার জুতো | ৩৫৩ চড়ুইপাখি
৪৬। জয় জয় জীবনের জয় জয়—উলুখাগড়ার জঙ্গল | ৩৬৩
৪৭। ওরে টিয়া তোকে যদি বলি কলাগাছ | ৪১০
৪৮। দিন গেল, মাস গেল কাটিল বছর | ৪১০ ছাতারে
৪৯। ওরে ওরে ফুৎকি, মাটিতে নামবি না? | ৪১১ ফুৎকি
৫০। ফটিকজল পাখিটির দেখা পেলাম সকালে | ৪১১ ফটিকজল
৫১। ভিঙে শালিক কাব্যে—ওহে ফিঙে চৌধুরী | ৪১১ ফিঙে
৫২। অলংকৃত কর তুমি আকাশের নীল | ৪১২ শিকারী পাখি
৫৩। ও রূপসী বণিক বধূ | ৪১২ কাজলগৌরী
৫৪। ঝাঁ ঝাঁ রোদে রুক্ষ মাঠের মাঝ দিয়ে | ৪২৩
৫৫। গাইবক, কোঁচবক, রাতবক | ৪৩৭ বক
৫৬। নীলসবুজের সাথে ইন্দ্রধনু করেছে মিতালি | ৪৩৮ ময়ূর
৫৭। কলির জটায়ু তুমি জয় জয় জয় | ৪৩৮ শকুনি
৫৮। বাবুই চোখ দিয়ে যা দেখছ তুমি | ৪৩৯ বাবুই
৫৯। যদিও পুরুষপাখি তবু যেন কিশোরী | ৪৪১ ল্যাজঝোলা
৬০। সব জলধর হতে আসিল কি নামিয়া | ৪৬১ চাতক পাখি

এ ছাড়াও কবি আনন্দমোহন আত্মগত ভাবপ্রকাশে মোট তেরোটি কবিতা রচনা করেছেন।

কবিতাগুলি যথাক্রমে:

উপরোক্ত পৃষ্ঠা মূলত গ্রন্থালয় প্রকাশিত 'বনফুল গ্রন্থাবলী'র 'ডানা' পৃষ্ঠা সংখ্যা। 'দশভাণ' নামক বনফুলের একটি একাঙ্ক সংকলনের মধ্যে ভবেশ গুড়ের কবিতা (বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের স্মরণে কি?)

ময়নামতীর চরে জাগে
শ্যাওলার স্বপ্ন
শাকুনিক আকুতি
ধূসর পিঙ্গল মিনমিনি পায়রা সব
খরচ
ভয়ানক খরচ
গুহ্য
অক্ষি কোটর

অন্য একাঙ্ক নাটিকা 'ত্রিনয়নের চবৈতুহি' উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন কবি বনফুল—

সংস্কৃতি পিয়াসী যাহারা
আসে তারা
গভীর নিশীথে।
চাপি ট্যাক্সিতে।

তারপর নৃত্যে ও সঙ্গীতে
আরও নানাবিধ রসে বিবিধ ভঙ্গীতে
হয়ে মাতোয়ারা
ফিরে যায় তারা।

—এখানে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি কবি বনফুলের।

বনফুল তাঁর কবিতা রচনা সম্পর্কে আত্মচরিতে লিখেছেন—'আমরা যখন প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিব এরূপ সজ্ঞান চেষ্টা আমাদের ছিল না। আমরা সেযুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা পড়িতাম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেন (গুপ্ত), অনুপমাদেবী, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এবং আরো অনেক উদীয়মান কবির কবিতা সাগ্রহে পড়িতাম। ইহাদের সকলের প্রভাব নিশ্চয়ই আমাদের মনের উপর এবং লেখার উপর পড়িত। কিন্তু আমরা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই যে এইসব মনীষীদের প্রভাব মুক্ত না হইতে পারিলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারা যাইবে না। আমাদের প্রায় সমকালীন একদল সাহিত্যিকের মনে কিন্তু এ চিন্তা জাগিয়াছিল।...পরে দেখা গিয়েছে তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।...আমার মনে এ ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নাই তাহার কারণ আমার সাহিত্যচর্চা কলিকাতার বাইরে শুরু হইয়াছিল।' (পশ্চাৎপট, পৃ. ৯৩ ২য় সংস্করণ, ২৩ জুন, ১৯৮২ খ্রি.)

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ব্যাখ্যাতা 'শ্রীম'

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের সূচনায় লিখেছিলেন—'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার ব্যাস হলেন মাস্টারমহাশয় অর্থাৎ শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত বা 'শ্রীম'। বাইবেলের প্রতিধ্বনি সমাসীন। God spell অর্থাৎ ঈশ্বর বলেছেন, কথামৃত ঈশ্বর বা অবতারের কথার সংকলন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'—শ্রীম কথিত যে সূচনা সেখানে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর শ্লোকটি হল—

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম কবিভিরীড়িতংকল্মষাপ্যম্।
শ্র্যবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।। (১০/৩১/৯)

এই শ্লোকের মর্মার্থ—তোমার কথা অমৃতের সমান, ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের প্রাণে তোমার কথামৃত সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করে। কবি অর্থাৎ জ্ঞানী লোকেরা তোমার বাণীকে স্তুতি করেন এবং মনের বড়ো মলিনতা, অজ্ঞানতা দূর হয়। তোমার কথা শুনলেই জীবের মঙ্গল হয়। ঈশ্বরের কথায় এমন সুষমা, এমন সৌন্দর্য যে সহজেই আমাদের মন কেড়ে নেয়। তোমার কথার শেষ নেই। ভূমণ্ডলে তোমার গুণগান যাঁরা করেন তাঁরাই পৃথিবীর বড়ো দানবীর। 'শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভাগবতের এই শ্লোকটিকে 'শ্রীম' ব্যবহার করেছেন ঠাকুরের সম্বন্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অমৃত। 'শ্রীম' সেই অমৃত মানুষকে পরিবেশন করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন করুণার গঙ্গা। আর 'শ্রীম' হলেন সেই করুণাধারা ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া ভগীরথ।

'কথামৃত' গ্রন্থে দুজন সবসময় আছেন। একজন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যজন হলেন 'শ্রীম'। সময় বয়ে চলেছে। ঠাকুরের ভাবধারাও বহমান। অদ্ভুত ত্যাগময় জীবন 'শ্রীম'র। তিনটি জায়গা থেকে উপার্জন করে তিনি তিন জায়গায় পাঠাতেন—একটি যেত বরানগর মঠে সংসারত্যাগী গুরুভাইদের সেবায়, অপরটি মাতা সারদামণি এবং অন্য সন্ন্যাসীদের সেবায় এবং শেষোক্ত উপার্জনের অর্থ ব্যয়িত হত তাঁর সংসার পালনে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই 'শ্রীম'। তিনি ঠাকুরের অন্যতম লীলাসহচর বা পার্ষদ। চৈতন্যদেবের যেমন পার্ষদকুল ছিলেন, ঠাকুরেরও তেমনি পার্ষদরা ছিলেন। বুদ্ধদেব বা খ্রিস্টেরও পার্ষদ ছিলেন। বুদ্ধদেবের

আনন্দ, সারিপুত্ত, আর জিশুর পিটার, জুডাস প্রভৃতি ভক্ত এবং পার্ষদ। 'কথামৃত'-এ শ্রীম নেপথ্যে থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন। 'কথামৃতে' তিনি 'মাস্টার', 'মণি', 'মোহিনীমোহন', 'একজন ভক্ত' ইত্যাদি নানা নাম ব্যবহার করেছেন। স্কুলে, কলেজে শিক্ষকতা করতেন বলেই তাঁকে বলা হত মাস্টারমশাই। মর্টন স্কুলের বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন। তিনি খুব ভালো পড়াতেন। রাশভারী মানুষ হলেও তাঁর রসবোধও ছিল অতুলনীয়। তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত ও বাইবেল খুব ভালোভাবে পড়া ছিল।

মাস্টারমশাই ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৬ আগস্ট ঠাকুরের শরীরাবসান হয়। প্রায় সাড়ে চার বছর 'শ্রীম' ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন। তবে তিনি কর্মের কারণে রবিবার এবং ছুটির দিনেই ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে নানা জায়গায় মাঝে মাঝে গেছেন। শোনা যায় 'কথামৃত' প্রথম ইংরেজিতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায়, পরে 'প্রবুদ্ধভারত' এবং অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর একইসঙ্গে কিছু আগে বা পরে পুস্তিকার আকারে ও খণ্ডে খণ্ডে বের হতে থাকে মাদ্রাজ থেকে। 'The Gospel of Sri Ramakrishna (according to M. a son of the Lord and disciple) or the ideal Man for India and the world.'

বাংলায় 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে, চতুর্থ ভাগ ১৯১৩ এবং শেষ তথা পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয় মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়া আরও জানানো যাচ্ছে যে, 'সাধু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করে সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বারা প্রকাশিত—এই পরিচয়েও 'কথামৃত' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন স্বয়ং 'শ্রীম'। নীলাম্বর মুখার্জির বেলুড়ের ভাড়াবাড়িতে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর পাণ্ডুলিপির একাংশ শুনিয়েছিলেন জননী সারদাদেবীকে।

'কথামৃত' প্রথমে বাংলা বা ইংরেজি যাতেই প্রকাশিত হোক, আজ যে চেহারায় 'কথামৃত' দেখা যায়, তার থেকে অন্য চেহারায় প্রকাশিত হয়েছিল, কারণ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—"I thank you a hundred thousand times, Master! You have hit Ramakrishna in the right point, Few, alas, few understand him! My heart leaps with joy and it is a wonder that I do not go mad when I find anydody thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on earth hereafter.'

অনেকে মনে করেন, 'শ্রীম' ঠাকুরের যেসব কথা লিখে রেখেছিলেন, তার সাহায্যে ঠাকুরের উপদেশের একটা বাংলা বই বের হয়েছিল। তার সম্বন্ধেই স্বামীজি

ওই মন্তব্য করেছিলেন। Gospel-এর প্রথম খণ্ড পড়েই পাশ্চাত্য থেকে দেশে ফেরা স্বামীজি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মাস্টারমশাইকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'Many thanks for your publication, only, I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form...Never mind, pay or no pay-let it see the blaze of daylight.' বাংলায় হয়—'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আপনি এত ছোটো আকারে বের করেছেন—আপনার খরচ উঠবে না। তারপর অভয় দিয়ে বলছেন, দাম উঠুক বা না উঠুক, এ বের হোক, এই সত্য প্রকাশিত হোক।

রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের হোতা ঠাকুরের ত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ যেমন নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, তারক, শশী, শরৎ, লাটু প্রমুখ তেমনি মহেন্দ্রনাথ, দুর্গাচরণ, গিরিশচন্দ্র, বলরাম, রামদত্ত, মনোমোহন মিত্র প্রমুখ গৃহী ভক্তগণও। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর অদর্শনের দু-মাস পরেই গড়ে ওঠে 'বরানগর মঠ', যেটি আগামী দিনের 'রামকৃষ্ণ মঠ' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন' উভয়েরই 'আঁতুড়ঘর'। বরানগর মঠও গড়ে ওঠে ও সেখানকার প্রতিদিনকার কাজ চলে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('শ্রীম'), চুনিলাল বসু প্রমুখ গৃহীভক্তের অর্থানুকূল্যে এবং নরেন, রাখাল, তারক, শশী, শরৎ প্রমুখ তরুণতর সন্ন্যাসীদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্রতা, তপস্যাকে অবলম্বন করেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে মূলত একজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহী ভক্তের প্রয়াসে। 'শ্রীম' অনেক আধ্যাত্মিক সুলক্ষণ সত্ত্বেও সংসারে সন্ন্যাসীজীবন যাপন করে গেছেন। নিজেকে গুপ্ত রেখেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের প্রায় দুশো দিনের কর্মকাণ্ড তাঁর অমৃতরূপ কথা সহ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। 'শ্রীম' তাঁর আদর্শ জীবনযাপনের দ্বারা বহু যুবককে রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আবার প্রচুর গৃহী ভক্তদেরও একত্রিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা আজীবন প্রচার করে গেছেন। 'শ্রীম দর্শন' বই থেকে জানা যায় যে, ঠাকুরের ভাবে বিভোর শ্রীম তাঁর ডায়ারিতে বিশেষভাবে স্বহস্তে লিখিত সূত্রগুলিকে সাজিয়ে পাঁচ খণ্ডে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন। শোনা যায় যে, যা উপাদান তাঁর কাছে ছিল তাই দিয়ে আরও পাঁচ-ছয় খণ্ড 'কথামৃত' বের হতে পারত। তিনি ঘটনাচক্রে পঞ্চম খণ্ডের প্রুফ দেখতে দেখতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। এই পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত বই তাঁর স্বহস্তে সজ্জিত ছিল। ১৯৩২ সালের জুন মাসে ফলহারিণি কালিকা পুজোর পরদিন তাঁর প্রয়াণ ঘটে। 'গঙ্গাসলিলে স্নান করিলে যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়, তেমনি 'গৌর জলধর' শ্রীমর 'কথামৃত' বর্ষণে মনের ময়লা বিদূরিত হয়। ভক্ত অলিকুল আসেন শান্তি সুখ মকরন্দ লোভে। করুণাময় শ্রীম নিজের দেহের সকল যাতনা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মকরন্দ প্রদানে দিবানিশি তৎপর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাগবতের পণ্ডিত' শ্রীম 'চাপরাশ' দিয়া ঘরে রাখিয়াছন সংসারতপ্ত

জনগণকে, 'ভাগবত' শুনতেই জগদম্বার নিকট চাহিয়া 'এক বগ্গা' দেওয়াইয়াছেন লোক-শিক্ষার জন্য'। (দ্বাদশ অধ্যায় অষ্টম খণ্ড 'শ্রীম দর্শন) উল্লেখ্য, 'রামকৃষ্ণ মিশন' ১ মে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আইনগতভাবে একটি 'রেজিস্টার্ড সোসাইটি'-তে পরিণত হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আর 'রামকৃষ্ণ মঠ' আইনগতভাবে একটি 'স্ট্রাস্ট' হিসেবে রেজিস্টার্ড হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। যদিও 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রথমে 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' হিসেবে ১৮৯৭ সালের ৫ মে নামাঙ্কিত হয়েছিল। 'শ্রীম দর্শন'-এর বিভিন্ন খণ্ডে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। কারণ রামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে সভা আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মিশনের সলতে পাকানো শুরু করেছিলেন। যা হোক মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রথম ও অন্যতম বাণী ও জীবনালেখ্য, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'ও তেমনি প্রথম ও অন্যতম পার্ষদদের স্বচক্ষে নিরূপিত বাণী ও জীবনালেখ্য।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীম দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সম্পাদিত (প্রথম-ষোড়শ খণ্ড), শ্রীম ট্রাস্ট, ১৯৫১ খ্রি।
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কার্তিক ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
৩। তব কথামৃতম্—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অষ্টম মুদ্রণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিকেশন ।
৪। 'উদ্বোধন'—১২৪ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, পঞ্চম সংখ্যা।
৫। উপেক্ষিত ও বিলম্বিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের খরচেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ছেপেছিলেন মাস্টারমশাই—শংকর, আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার ২২ মে, ২০২১।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর পাশ্চাত্য ভাবনা

বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভিন্নধর্মী দুটি সংস্কৃতি ও সমাজধারার সুষম সমন্বয়ের ওপরে। এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি তিনি ভারতে আনতে চেয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের অন্যতম স্মরণীয় স্রষ্টা হিসেবে তিনি ভারতবর্ষকে মনে করতেন একটি মানবজাতির বৃহৎ গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি, তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও নানাবিধ পরিকল্পনা পরীক্ষানিরীক্ষার আলোকে সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনসেতু। যাতে জাতির সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও শক্তিশালী হতে পারে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিমিত বস্তুবাদের পরিকল্পনা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের।

এই বলিষ্ঠ অগ্রগতির পরিকল্পনায় ভারতবর্ষ অন্যান্য আফ্রো-এশীয় জাতিগুলির মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা অগ্রবর্তী জাতিগুলির কাছ থেকে কারিগরি এবং অন্যান্য ধরনের সাহায্য সর্বপ্রকারে গ্রহণ করে চলেছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সফরে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই গ্রহণ-মিলনের প্রচেষ্টা। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি বরাবর জোর দিয়েছিলেন মানবসমাজের সমস্যার আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও মাত্রার ওপর ও আধুনিক যুগে মানবজাতির সম্পর্কের ওপর।

এত পরিপূর্ণতা ও সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বাণী গ্রহণ করেছিলেন যে, যে-কোনো পশ্চিমি মানুষ তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারেন, কিন্তু একই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু ধারণ করতেন। সেটা হল পাশ্চাতের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ধার করেও তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতা। বিবেকানন্দের মধ্যে অন্তর্লীন এই 'অতিরিক্ত কিছু': এটি তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণেরই মূল্যবান দান। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তি চরিত্রের এই মাত্রার দিকে দৃষ্টি দিয়ে মনীষী রমাঁ রল্যাঁ বলেছেন, "I shall try to show how closely allied is the aspect of Vivekananda's thought to our own, with our special needs, torments, aspirations, and doubts,

urging us ever-forward like a blind mole, by instinct, upon the road leading to the light. Naturally I hope to be able to make other westerners, who resemble me, feel the attraction that I feel for this elder brother, the Son of the Ganges, who, of all modern men, achieved the highest equilibrium between the two diverse forces of thought and was one of the first to sign a treaty of peace between the two forces eternally warring within us; the forces of reason and faith.'

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সমাজবিপ্লবী। সংগঠন শক্তির সাহায্যে কত কিছু করা যায় তা তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কী করে নিজের দেশের জনগণের কাজে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস থেকে তাঁর এক ভারতীয় শিষ্যকে স্বামীজি এক পত্র লিখেছিলেন। মেয়েদের এক আধুনিক কয়েদখানা দেখে আসার পর, সেই পত্রে ভারতীয় জনগণের অবস্থা এবং দুঃখদুর্দশার জন্য তাঁর মনের বেদনা যেন ঝরে পড়েছে। 'এখানে কারাগার বলে না, বলে—সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অতি অদ্ভুত জিনিস। কারাবাসীগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! না দেখিলে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের সামান্য লোকদের পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই, ...হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মারই বহু রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।'

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে শিকাগো থেকে ভারতের এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানজিকে স্বামীজি লিখেছিলেন। 'সংগঠন ও সংযোগশক্তিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সহায়তা দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে।'

উনবিংশ শতকের অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশে যাঁদের মৌলিক অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হয়েও বিবেকানন্দ কিন্তু উপেক্ষিত থেকে গেছেন। তার মুখ্য কারণ তিনি ধর্মাচার্য হিসেবেই বহুল পরিচিত। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞান কতটা সুগভীর ছিল তা পাশ্চাত্য দেশীয় এরিক হ্যামন্ড-এর স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক শিল্পের গুরুত্বের সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয় করেছিল। দারিদ্র্য দুর করে একটি প্রগতিশীল দেশ হতে হলে ভারতকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে হবে। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রই সব কিছুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে হইবে।' শিল্পায়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাই কারিগরি শিক্ষার ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার দুটি উদ্দেশ্য সাধন করবে। প্রথমত, শিল্পগঠনে বিশেষ সহায়ক হবে এবং দ্বিতীয়ত, হেলায় সময় নষ্ট এবং চাকুরির জন্য ক্রন্দনের পরিবর্তে লোকে কাজ করে উপার্জন করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিবেকানন্দই জামশেদজি টাটাকে ১৮৯৩ সালে দেশে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালে ভারতে বিজ্ঞানে উচ্চ ও মৌলিক গবেষণার জন্য ত্রিশ টাকা দান করে সারা দেশে সাড়া ফেলে দেন। এ সময়ে ১৮৯৮ সালের ২৩ নভেম্বর বিবেকানন্দকে লেখা কৃতজ্ঞ টাটার চিঠি বিশেষভাবে পাঠযোগ্য।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, ভারতকে যদি বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশের শক্তি ও সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় দ্রব্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করার বিষয়েও তিনি চিন্তা করেছিলেন। শিল্পের প্রসারের জন্য দেশে কর্মশালা (Workshop) খোলার পাশাপাশি ইউরোপে ও আমেরিকায় এসব কর্মশালার দ্রব্য বিক্রির জন্য তিনি (association) খুলতে চেয়েছিলেন। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেখবে ভারতের-জিনিসের এখনও কত কদর।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার ফারাক বিবেকানন্দ ঘোচাতে চেয়েছিলেন। বিশ্বায়ন ও বিশ্বনাগরিকত্বের যে ধারণার প্রচলন আমরা আজ দেখতে পাই, বিবেকানন্দকে তার একজন অন্যতম প্রাচীন প্রবক্তা বলতে পারি। ভারতকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরস্পরের ভাব তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাব ও কীর্তির পারস্পরিক আদানপ্রদানের অভিপ্রায়ই বিবেকানন্দ প্রকাশ করেছিলেন। 'ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।' বিবেকানন্দ পারস্পরিক সহায়তায় বিশ্বাসী ছিলেন, একমুখী নির্ভরতায় নয়। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যময় ভাবরাশির সুষম

মেলবন্ধন ঘটুক তাই তিনি চাইতেন।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা থেকে বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এবং সতর্ক হয়েছিলেন যে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি ছাড়া শুধুমাত্র বৈষয়িক সভ্যতার বিকাশ বহু প্রকার সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, 'নানা কলকারখানা করে ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করে দিচ্ছে।'

বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল Global এবং Holistic। তিনি এমন একটি সামগ্রিক উন্নয়নের মডেল ভেবেছিলেন যা অন্যান্য দেশের কাছ থেকে গ্রহণ করবে কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাবধারায় পুষ্ট হবে, চরিত্রে হবে সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয়। শিল্পায়ন বা কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজির যা চিন্তাধারা ছিল তা হল এই বিষয়ে অগ্রগতি শুধুমাত্র ঘরে থাকলে সম্ভব নয়। প্রয়োজনে যেখান থেকে যা কিছু ভালো পাওয়া যায় তা দেশের উন্নতির জন্য দেশের বাইরে গিয়েও শিখে আসতে হবে, তার প্রয়োগ করতে হবে ভারতবর্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী। স্বামীজি ভারতবর্ষের মানুষজনের কারিগরি শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা শুধুমাত্র যে ভারতের পুরুষদের জন্য করেছিলেন তা নয়, তিনি ভারতের মেয়েদের সমানভাবে তৈরি করার কথা ভেবেছেন। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক সরলা ঘোষালকে ২৪/০৪/১৮৯৭ তে যে চিঠি লেখেন সেখানে ওই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন— 'দরিদ্রের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির সময় এখনও আসে নাই। ক্রমশঃ (রামকৃষ্ণ মিশনের) ওই সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি শেখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয় তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক—যে প্রকারে পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই।'

আরও বিস্মিত হবার মতো বিষয় হল যে, স্বামীজি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে শিল্পায়নের চিন্তা করেই থেমে থাকেননি, তিনি ভারতবর্ষের কোন জায়গায় কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির কীভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়, সেসব সম্বন্ধেও ভেবেছেন। বৃহৎ শিল্পবিদ্যালয় ও কারখানা খোলার সম্বন্ধে স্বামীজির চিন্তা লিপিবদ্ধ করা রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলির মধ্যে। স্বামীজি লিখছেন—'মহাবলশালী সমাজ ভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়। যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজ শাসন হইতে দূর থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইবে।... মধ্যভারতে হাজারী বাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি

এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশের এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপরে একটা বৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমন আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমন-ই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।' উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রির সম্বন্ধে স্বামীজির ভাবনাচিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে ভগিনী নিবেদিতার ০৬/০৩/১৮৯৯-এর চিঠিতে—যে চিঠিটি তিনি লিখেছেন মিসেস বুলকে। তিনি লিখছেন, 'স্বামীজী...ভারতবর্ষ ও তার জনগণ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তাঁর মন এত দ্রুত সঞ্চরণ করছিল যে আমার পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হচ্ছিল। জনসাধারণের জন্য রুটি জোগাড় করার কোন নতুন উপায় বার করা যাবে? কি করে কলোনি তৈরী করা যাবে? মানুষ তৈরীর প্রয়োজনে খাদ্যশস্য উৎপাদন কিভাবে করা যাবে? সেখানকার ট্রেড-সিক্রেট কেনবার জন্য টাকা জোগাড় করা যাবে কেমন করে? এবং কি ভাবেই বা তাকে ব্যাপক ভাবে (এ দেশে) জানিয়ে দেওয়া যাবে?'

স্বামীজি শিল্পায়ন বলতে প্রধানত বৃহৎ শিল্পায়নই বুঝতেন। স্বামীজির কালে পাশ্চাত্য দেশে শিল্প মাত্রে বৃহৎ শিল্প। তাই স্বামীজি যখন পাশ্চাত্যের কাছে শিল্পশিক্ষা নেবার কথা বলেছেন তখন নিঃসন্দেহে বৃহৎ শিল্পায়নের দিকেই তাঁর নজর ছিল।

তথ্যসূত্র:

১। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী, ভারতবর্ষের কার্যপ্রণালী ২৭ ও ২৮।

২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫-৫৬।

ভারতীয় শিল্পের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববার্তা

ভূ মি কা:

শিল্পের পৃথিবীকে বলা যেতে পারে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: (১) বাচনিক—অর্থাৎ গদ্য, পদ্য ও নাটক (২) চাক্ষুষ—অর্থাৎ অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য; এবং (৩) অভিনয়—অর্থাৎ সংগীত, নৃত্য ও নাট্যসাহিত্য। এই শিল্পে শৈলীগুলিকে আরও শ্রেণিবদ্ধ করা যায় বিস্তৃতির শিল্প (অঙ্কন স্থাপত্য), সময়ের শিল্প (সংগীত) এবং বিস্তৃতি ও সময়ের শিল্প হিসেবে (নৃত্য ও নাটক)। গদ্য, পদ্য ইত্যাদির শিল্পকে ধরা যেতে পারে বিস্তৃতির শিল্প হিসেবেও, তবে তা অত্যন্ত সীমিতভাবে। এটাই অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত শিল্পের অথবা সৌন্দর্যের প্রাথমিক নকশা। শিল্প হল সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই মর্মে, যেখানে আনন্দ লাভ করা যেমন আনন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কোনো মাধ্যমের অতীতে যেতে সক্ষম বা মাধ্যমকে ছাপিয়ে যেতে পারে।

প্রকৃতির অসাদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে, অথবা এমনকি মানুষের অন্তরের ঐকতানের মাঝে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে আমাদের অস্তিত্বটা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জন্মলব্ধ অধিকার। এইটা কোনো বিশেষজ্ঞের বিষয় নয়। উট মরুভূমির বিশেষজ্ঞ হতে পারে; পাখি হতে পারে আকাশের এবং মাছ হতে পারে জলের। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সমস্ত ক্ষেত্রের সৌন্দর্যের উপলব্ধি ও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। একমাত্র মানুষই শুধুমাত্র মরুভূমির প্রশংসা করতেই পারে নয়, পারে উটেরও প্রশংসা করতে; শুধুমাত্র সমীরণের প্রশংসা করতেই নয়, পারে পাখিরও প্রশংসা করতে; শুধুমাত্র জলের প্রশংসা করতেই নয়, পারে মাছেরও প্রশংসা করতে। মানুষের ক্ষেত্রে আরও যেটা বেশি তা হল নিজের ছাড়াও অন্য সব কিছুর মধ্যেও সৌন্দর্য দেখতে পায়, সে নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, যা সে অন্তর্নিহিতভাবে নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করে তার নিজের জীবনের সুর তাল লয় ও ঐকতানের সঙ্গে মিলিয়ে, এক সম্ভ্রম উৎপাদক স্থায়ী ও নিশ্চিত অস্তিত্বের মধ্যে, যেটি হল অনন্তের দিকে যাত্রা অর্থাৎ আনন্দের উদ্দেশে। এটি বোধহয় এক পরস্পর

বিরোধী উক্তি হবে যদি বলা হয় যে, সৌন্দর্য হল এমন একটি জিনিস, যার প্রতি মানুষ চিরকালই উদাসীন থাকতে পারে।

১

মানুষ শুধু খাদ্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে না। এই একটি জায়গায় পশু-মানব নতি স্বীকার করে উচ্চতর মানুষের কাছে, সত্যিকারের মানুষ হল সেই, যে আপাত বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বার্থে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ও জয় করে সৌন্দর্যের দুঃসাহসিক ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে পথ পরিক্রমা করে। সৌন্দর্যের অনুভূতি মানুষের সহজাত। এটিকে শেখানো যায় না; এটি শেখাও সম্ভব নয়। এটিকে অনুভব করতে হয়। এটি এমন এক মূল্যবোধ যেটিকে বিশ্লেষিত করা অথবা মাপা যায় না। অপর দুটি মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে যা হল যথাক্রমে সত্য ও মহত্ত্ব! সত্যি কথা বলতে কী, এই তিনটি হল মৌলিক, চিরন্তন মূল্যবোধ যা মানুষ, আত্মসচেতন জীব হিসেবে, তার ক্ষমতা অনুযায়ী পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করে চলেছে ইতিহাসের সব বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে। অন্তিমে এই তিনটি মূল্যবোধই কিন্তু এক এবং এটাই স্বামী বিবেকানন্দ মানব-আত্মার স্বর্গীয় নির্যাস বোঝার কালে মনঃশ্চক্ষুতে দেখতে পেয়েছিলেন। এটিই হল শিল্পের জাগতিক বার্তা, যা তিনি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষের প্রগতি বস্তুবাদের উন্নতির ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত জীবনের ওপর যেটি আবৃতকে অনাবৃত করার এক ক্রম প্রক্রিয়া, অর্থাৎ মানুষের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া যা তার মধ্যে নিহিত। এটিই হল সৌন্দর্য।

আমাদের সকলেরই এটি খুব ভালোভাবে জানা আছে যে, গোলাপের সৌন্দর্য শুধু তার পাপড়ি অথবা সুগন্ধের মধ্যে নিহিত নয়। গোলাপের সবটুকু, যা এক আবৃতকে অনাবৃত করার প্রক্রিয়া, সম্পূর্ণভাবে এক নির্দিষ্ট আকারে ফুটে ওঠাটাই হচ্ছে এক চিরন্তন আনন্দ তার।

মানুষের ক্ষেত্রে তার আধ্যাত্মিক ফুটে ওঠার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে, যেটি তার সহজাত বন্দিশালা। এই সহজাত বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে আসার সাফল্যের অনুভূতিই মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে তার জীবনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিতে, কোনো প্রাকৃতিক সমাধানের মধ্য দিয়ে নয় বরং এক বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতায়। এই বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতাই তাকে সাহায্য করেছে অনন্তকে জয় করার স্বপ্ন দেখতে। আর তাই এখানেই রয়ে গেছে মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি তীর্থযাত্রার গুরুত্ব।

শিল্পের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক বার্তা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যেতে পারে :

১। জীবন চেতনার নিজস্ব এক অতুল ঐশ্বর্য আছে, যা জৈবিক চেতনাকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হতে পারে;

২। এই সেই ঐশ্বর্য যার সাহায্যে মানুষ তার আদর্শ শিল্পের পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে এই একমাত্র শাসনকর্তা;

৩। মানুষকে তার দেখভালের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় না: অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো ঐশ্বরিক তত্ত্বাবধানের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি কাম্যও নয়। কারণ মানুষ নিজেই প্রচ্ছন্ন রূপে ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয়।

মানুষের চেতনার পারমার্থিক বিবর্তন, স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বাহ্যিক কোনো সমন্বয়সাধনের ফল নয়। এর এক নিজস্ব বিচারশক্তির আগুন আছে, যার সাহায্যে এটি সত্যসন্ধানী হতে পারে সমগ্র পৃথিবীর ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমতানে। এটিই হল সৃষ্টিধর্মী সম্পূর্ণতার নৈসর্গিক জগৎ, যা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার বহু ওপরে ও বহু দূরে অবস্থিত। এখন প্রশ্ন হল—'সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কী? বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই উত্তর দিতেন—এটি হল চিরন্তন সত্যের কাছে মানুষের সৃষ্টিধর্মী আবেগের স্বাভাবিক জবাব।' মানুষের মধ্যের অমর আত্মাই হচ্ছে অনন্ত জীবনীশক্তি যা সৃষ্টি করে জানবার পৃথিবীর পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলির গভীরতার ব্যাস। কিন্তু আমার নিজস্ব আত্মার বাস্তবতা আমার কাছে অব্যবহিত ও সন্দেহাতীত। আমার অন্তরের বাস্তবতার স্বাভাবিক চেতনা চায় সমর্থন আমার বাইরের চিরন্তন স্পর্শের মাঝে। আর এই সমর্থন এক সুন্দর ঐক্যের দ্বারা ছন্দবদ্ধ হয় আমার অন্তরের বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে, এই ঐক্যের আনন্দের মধ্যেই আমরা আমাদের জীবনধারণকে প্রকাশ করি; আর এটাই হচ্ছে মানুষের পারমার্থিক বিজয়, সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন, কবির কথায় ('সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/তোমার মাঝে আমার প্রকাশ তাই এত মধুর')—যার নাম আনন্দ।

২

আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য (শব্দটি আমারই সৃষ্ট) যেমনটি দার্শনিক সন্ত স্বামী বিবেকানন্দ বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেছিলেন, বলা যেতে পারে এইভাবে যে সেটি নিহিত রয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার ক্ষমতার মধ্যে, যার সম্পর্কে সে অবশ্যই অবহিত, তার প্রাকৃতিক ঐকতানের বোধগম্যতার মধ্যে এবং তার নিজের সঙ্গে প্রকৃতির বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে, অর্থাৎ বিশ্বজনীন একতার মধ্যে। যখন মানুষ তার বাহ্যিক ছন্দ

আনন্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের কাছে ফিরে এসে আপন অন্তরের দিকে তাকায়, একবার তখনই সে বুঝতে পারে যে, তার অস্তিত্বের ওপরে যে অভিজ্ঞতালব্ধ পরিবর্তনশীল অঙ্গীকারগুলি রয়েছে তা নিতান্তই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আত্ম-স্বার্থের, কামনা বাসনা ও লোভের জন্যই। তখনই সে বুঝতে পারে যে, আমাদের অস্তিত্বের গভীরে এক চিরন্তন চেতনার ঐক্যের আবাস যা আমাদের সমস্ত কর্মের মধ্যে প্রতিভাত, প্রকটিত আমাদের যুক্তিতর্কের মধ্যে এবং অবশ্যই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে। ব্যক্তিগত পছন্দের পর্দার ওপারে, অভ্যাস এবং অগভীর প্রচলিত রীতিনীতির ওপারে, মানুষ তখন আত্ম-স্বার্থ বিসর্জনের আহ্বানে বের হয়ে আসে এবং জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে যা এককভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই উপলব্ধিটাই হল পারমার্থিক সৌন্দর্যের পুরস্কার, যেখানে 'লোভ' পরিবর্তিত হয়ে যাত্রায় আত্মত্যাগে এবং একমাত্র সেখানেই মানুষ মূর্তিপূজা, মন্দির, ধর্মপুস্তক, মহাপুরুষ ও পূজা অর্চনা ও উৎসবের হাত থেকে স্বাধীন হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের অন্তর-অনুভূতি সর্বোচ্চ ঐক্যের অভিজ্ঞতা, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে মানুষের অনুপম সৌন্দর্য, যেখানে একজন ব্যক্তিগত মানুষ অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বজনীন মানুষের ঊর্ধ্বতম সত্য ও গরিমায়। তাঁর নিজের কথায় এটাই হল দেবত্ব। মানুষের মধ্যে যেটা অসামান্য সেটা হল তার বোধ বা চেতনার প্রগতিশীলতা যা ক্রমেই গভীরতা প্রাপ্ত ও বিস্তৃত হতে থাকে শাশ্বত মানবকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে। দেহের জন্মমৃত্যু আছে, কিন্তু মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। মানুষের মধ্যে যা চিরন্তন তা হল তার সৃষ্টিসুখের উল্লাসের প্রকাশ যা তাকে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করে; তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সেটি তার নিজের ব্যবহারের জন্য, বরং সমস্ত অনিচ্ছুক কাজের মধ্যে তার সৃষ্টির অন্তিম প্রকাশ—সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তার সৃষ্টির অন্তিম প্রকাশ—সাহিত্য ও ভাস্কর্যের কাজের মধ্যে, সেবামূলক কাজ ও পূজা-অর্চনার মধ্যে, দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে। এটিই হল বিবেকানন্দের পারমার্থিক সৌন্দর্যবোধ যা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, ধর্মের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গোঁড়ামি, দর্শনশাস্ত্রের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যুক্তিতর্কের পদ্ধতির কাঠিন্য, সেবামূলক কাজের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যক্তিগত সঞ্চালন এবং পূজা-অর্চনার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। যেটি প্রয়োজন তা হল ঐক্যের এক প্রবল অনুভূতি যা মানুষকে সাহায্য করে নাম ও দেহগত বৈশিষ্ট্যের অনেক ওপরে উঠতে, অর্থাৎ পার্থক্যগত ও বাহ্যিক আপস সীমাংসার পৃথিবীর অনেক ওপরে উঠতে। এই ঐক্যের নীতিই হচ্ছে ছন্দবদ্ধতা ও ঐকতানের নীতি, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে বিশ্বজনীন এককের সৌন্দর্য; আর এটিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়; কখনোই এটিকে নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই।

৩

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে একটি আলোচনা সভায় স্বামী বিবেকানন্দ (সম্পূর্ণ রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, মায়াবতী, পৃষ্ঠা ২০০-২০৬) শৈল্পিক কাজে মানুষের মৌলিকত্বের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মৌলিকত্ব বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন অনুভূতির দৃঢ় অঙ্গীকার, হৃদয় ও আত্মার অবশ্য পালনীয় আদেশ, যা মানুষকে সাহায্য করবে প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে যা অনুন্মোচিত তাকে ধীর লয়ে উন্মোচিত করতে। এই ক্রম-উন্মোচনের প্রকাশের মাধ্যম অবশ্য বিভিন্ন হতেই পারে।

স্বামীজি বলেছেন যে, শিল্পের উৎস নিহিত আছে কিছু ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তার উন্মোচিত প্রকাশের মধ্যে। এবং তিনি আরও বলেছেন যে, এই ধ্যানধারণা বা ভাবনা চিন্তাদের যে-প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে অপরিহার্যভাবে থাকতেই হবে তারও কোনো অর্থ নেই। এই ধ্যানধারণা হতে পারে (অবশ্য স্বামীজি বলতে ভালোবাসতেন অবশ্যই সবসময়ে হবে) সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অতীত আদর্শ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। সংক্ষেপে, স্বামীজির মতে সৌন্দর্য নিহিত আছে আদর্শ ধ্যানধারণার মধ্যে (এবং উপলব্ধির মধ্যে) যা এক আধ্যাত্মিক ঐক্যের যেটি আবার অন্তর্নিহিত ভাবেই প্রতিটি মানুষের কাছে মৌলিক। এই অনুপম, মৌলিক, আধ্যাত্মিক ঐক্যের সৌন্দর্যটি যে কী তার কোনো প্রতিচিত্র হতে পারে না। এটাই হল মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের সত্য এবং ভালো মানুষের অনিচ্ছুক কাজের অবশ্যই পরহিত ব্রতে। সৌন্দর্য হল আমাদের কান্তিবিদ্যা, সংবেদনশীলতার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাপ্তি মাত্র, যা আমাদের ভগ্নাংশ থেকে পরিপূর্ণতা, ব্যক্তি থেকে নীতি, বহুধা বিভক্তি হতে ঐক্য, বিবাদ থেকে মিলন, কোলাহল থেকে ছন্দ এবং সীমিত থেকে অসীমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতার সৌন্দর্য মানুষকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করে: মানুষ এবং চূড়ান্ত সত্যের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ নৈকট্যতার এটাই হল ভিত্তিভূমি, চিরন্তন ও অসীমের মধ্যে; এটাই হল চরম সাম্য, অনির্বচনীয়।

৪

বিবেকানন্দ কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি দেবত্বকে বিশ্বাস করতেন। এটি হল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব যা প্রকাশিত হয় যখন মানুষ নিজের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে যা তাকে ব্যক্তি ও বস্তুর

ভ্রান্তিজনক বিচ্ছিন্নতার মায়াজাল থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এমন একজনের কাছে নিয়ে যায় যাঁর উপস্থিতি সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান, সর্বোচ্চ চেতনা, সচ্চিদানন্দ। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবোধের মূল ধারণাটাই হল আনন্দ বা পরম সুখ। এটি হল 'বিশ্বজনীন এক' এই ধারণার তাৎক্ষণিক বোধ যা ঐক্যবদ্ধতা ও পরিচিতির ছন্দবদ্ধতার মাধ্যমে প্রকাশিত। আত্মার অমরত্বই হল একমাত্র বিশ্বজনীন একক সত্য যা উপলব্ধির আনন্দের মধ্যে নিহিত, যার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের সর্বোচ্চ বিজয়ের সম্ভাবনা।

মানুষের সৌন্দর্য-ভাবনার অনুভূতি উদ্ভূত হয়েছে তার মৌলিকত্ব থেকে যেটি অনুপ্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টির যোগফল। শৈল্পিক যে-কোনো কাজে উদ্দেশ্যের আন্তরিকতাকে সফল হতেই হবে এবং সেটিকে সকলের প্রশংসার্হও হতে হবে। জন্মসূত্রে মানুষ হল এক শিল্পী তা সেটি সৃজনশীলতা অথবা সমঝদারিতা যে ক্ষেত্রে হোক না কেন, কারণ মানুষের এক জন্মলব্ধ বোধ আছে ঐকতান এবং ছন্দবদ্ধতার সম্পর্কে, যেটি সে প্রথম উপলব্ধি করে তার দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অমোঘ ছন্দে, তার শারীরবৃত্তের একইরকম নিয়মানুবর্তিতায়। তারপর মানুষ প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে উচ্চতর নিয়মানুবর্তিতা আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হয়, দিবারাত্রি আসা-যাওয়া, ঋতুকালগুলির নিয়মমাফিক আগমন, মরুভূমি, অরণ্য, সমুদ্র ও নদী, পর্বত ও গাছপালা, এবং এমনকি সব স্বর্গীয় বস্তুদের অবস্থান পরিবর্তনের মধ্যেও। ধীরে ধীরে মানুষ অবস্থান পরিবর্তন করে নিজের কাছেই ফিরে এসে নিজের শক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে ওঠে (শিল্পসৃষ্টির মাধ্যম) এক ছন্দবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে যার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র সে নিজেই। এইভাবেই একজন মানুষ শিল্পস্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটি সত্য।

স্বামীজি বলেছেন যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, বৌদ্ধযুগে আমাদের দেশে শিল্পের যে উন্নতি হয়েছে তেমনটি তিনি আর কোথাও দেখেননি। তাঁর মতে মুঘল যুগেও এ দেশে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল; তাজমহল, জুম্মা মসজিদ তখনকার সংস্কৃতির জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে। স্বামীজি বলেছেন যে, প্রাগৈতিকহাসিক যুগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সাল অবধি ছিল মাইসিনোইয়ান শিল্পের যুগ যেটি প্রধানত নিজেকে এশিয়ান শিল্পকে নকল করার কাজে ব্যাপৃত রেখেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সাল থেকে ৪৭৫ সাল অবধি ছিল আর্কাইভ গ্রিসীয় শিল্পের যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৫ সাল থেকে ৩২৩ সাল অবধি ছিল ক্লাসিক গ্রিক আর্টের যুগ। এই সময়ের শিল্প সমস্ত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার নিগড় থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই মন্তব্য মেনে নিতে বিবেকানন্দের কোনো দ্বিধা ছিল না যে, সত্যিকার শিল্প হল সৌন্দর্যের এক নিষ্কলঙ্ক অলৌকিকতা; এটি এক গৌরবজনক নিদর্শন, নিখাদ

এবং মহান ধ্যানধারণার, যা মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকে। অ্যাটিক স্কুল অফ গ্রিক আর্টের সম্বন্ধে স্বামীজি এই মন্তব্যটির অবতারণা করছেন, বোধহয় এই ব্যাপারে তাঁর পরিপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করতেই।

শিল্পকর্মে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সেটা পেন্টিং অথবা ভাস্কর্য অথবা স্থাপত্যবিদ্যা অথবা এমনকি গানবাজনা যাই হোক না কেন, হচ্ছে একটি আদর্শের প্রসার যার মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির আর্ত আকুতি মিশে থাকবে এবং যেটির প্রকাশ ঘটাতে সে যে-কোনো মাধ্যমকেই বেছে নিতে পারে। এই ব্যাপারটিতে শিল্পী সম্পূর্ণ থাকে স্বাধীন। উদ্দেশ্যের স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনতাকে খাপ খাওয়াতে হবে মানুষের দ্বারাই তার সৌন্দর্য ভাবনার স্বাধীনতার মধ্যে যা সমস্ত দেশে এবং কালে ভীষণরকম ভাবে মানবিক।

গদ্য, কবিতা ইত্যাদি মৌখিক শিল্পের ব্যাপারে স্বামীজির মত সম্পর্কে তাঁর লেখা অথবা ভাষণ থেকে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে (স্বামী-শিষ্য সংবাদ) করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। বিবেকানন্দ কবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন কারণ রাবণের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি যে স্বাধীনতায় মানুষের বিশালতাকে এঁকেছিলেন তা অনবদ্য।

প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সেখানে তিনি এক মার্বেল পাথরে খোদাই করা মূর্তি দেখেছেন যার নীচে লেখা ছিল : শিল্প প্রকাশ করছে প্রকৃতিকে। এটি অবশ্যই স্বামীজির নিজস্ব সৌন্দর্য ভাবনার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল; এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, এভাবেই শিল্প নিজের হাতে সমস্ত আবরণের পর্দা সরিয়ে প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্যকে দেখতে পায়। এবং এই ব্যাপারটিই আমি, প্রথমেই বলতে চেয়েছিলাম 'আবৃতকে অনাবৃত করা' এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে। বিবেকানন্দ অবশ্য অত্যন্ত সুপটুভাবে বলেছেন যে মানুষের সৃষ্ট শিল্পকর্মেরা এমনই যে সেগুলি যেন উচ্চকিত কণ্ঠে বলে চলে যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অদ্যাবধি পুরোপুরি প্রকাশিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একজন শিল্পী হিসেবে মানুষ একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিসের সৌন্দর্যেও বিমোহিত হয়ে ওঠে যদি সেটির অপরূপ প্রকাশ ঘটে। মোটের ওপর স্বামীজি এটাই বোঝাতে ও দেখাতে চেয়েছেন যে, মানবসৃষ্ট সব শিল্পকর্মই প্রধানত অসম্পূর্ণ। শিল্পের এই অসম্পূর্ণতা কোনো বাধা অথবা আদৌ দোষের নয়; বরং শিল্পসৃষ্টির এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ অনুন্মোচিতকে উন্মোচিত করার প্রচেষ্টার কোনোমতেই থেমে যাওয়া উচিত নয় তা সে যতই বাধাপ্রাপ্ত হোক না কেন। থেমে যাওয়ার সব শেষ ক্ষেত্রটি হল যখন পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যখন মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হয়ে এক সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্যে বাস করতে পারবে, যেটি হল এক নৈসর্গিক আনন্দের বিশ্বজনীন অনুভূতি।

৫

এটি উল্লেখ করার ব্যাপারে বিবেকানন্দ অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন যে প্রতিটি জাতিরই এক জাতিগত চরিত্র আছে যা তাদের প্রচলিত সংস্কৃতির মাধ্যমে রূপায়িত, এবং সেই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই সংস্কৃতি দৃশ্যমান হয়। স্বামীজী বলেছেন যে, যেসব মানুষেরা জড়বাদী তারা প্রকৃতিকেই তাদের আদর্শ জ্ঞান করে তাদের শৈল্পিক ভাবনাদের প্রকাশে ব্রতী হয়। কিন্তু যেসব মানুষদের আদর্শ প্রকৃতির উর্ধ্বে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বাস্তব তারা তাদের শিল্পকর্মের প্রকাশ ঘটাতে চায় প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নিয়েই সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের শিল্পের প্রধান ভিত্তিই হল প্রকৃতি; আর শেষোক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের শৈল্পিক উন্নতির প্রধান অভিপ্রায়ই হল আদর্শবাদ। আর এই আদর্শবাদকে স্বামীজি বোঝাতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে। ভারতীয় শিল্পের এটাই হল চারিত্রিকতা।

প্রসঙ্গত, স্বামীজী সেই নকশাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন যেটি তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক হিসেবে এঁকেছিলেন। এখানে আঁকা ছিল একটি হ্রদ আর তার পিছনে উদীয়মান রক্তসূর্য। আঁকা ছিল এক সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম, এবং তার মধ্যে একটি রাজহংস বা মরাল; গোটা ব্যাপারটিকে ঘিরে ছিল এক ভুজঙ্গ। অবশ্যই এটি ছিল এক মহান শিল্পকর্ম, কারণ এটি ব্রহ্মাণ্ডের অতীত এক আদর্শের প্রকাশ ঘটিয়েছে। স্বামীজি নিজেই যেমনটি এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন : ছবিটির মধ্যে উর্মিমালা সংবলিত জলরাশি হল কর্মের প্রতীক; প্রস্ফুটিত পদ্মটি বলে ভক্তির কথা, আর উদীয়মান সূর্য হল জ্ঞান। জড়িয়ে থাকা ভুজঙ্গের অর্থ হল যোগ জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি সহযোগে (মানুষের জন্মলব্ধ প্রচ্ছন্ন শক্তি); রাজহংসটি পরমাত্মার প্রতীক। স্বামীজি বলেছেন যে ছবিটির মধ্যে যে আদর্শ ভাবনার প্রকাশ তা হল কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগক্রিয়ার মাধ্যমে পরামাত্মার দর্শন লাভ।

৬

সৌন্দর্য, এর এক বিমূর্ত ভাবনার চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে পরোৎকর্ষ বা চরম শ্রেষ্ঠতার পানে; এটি কোনো সময়েই স্থবির নয়। বিবেকানন্দের মতো মানুষ এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তার শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে, আত্মবিশ্বাসের আনন্দময় পৃথিবীতে বাস করতে করতে, এক ক্রমান্বয়ী আশ্বস্ততার সঙ্গে, যেটি একমাত্র কল্পনার অনুভূতিই তার কাছে প্রকাশ করতে পারে। ঐশ্বরিক একতার আদর্শ ও তার সঙ্গে পরম আনন্দের নিখাদ অনুভূতিই একমাত্র প্রয়োজন

সত্যিকার সৌন্দর্য যে কী তা বোঝার জন্য। শুধু অঙ্কনে বা সাহিত্যে নয়, বরং নৃত্য, গীত, নাটক, ভাস্কর্য, স্থাপত্যবিদ্যা (সংক্ষেপে সমস্তরকম প্রথাগত শিল্প) ইত্যাদি, সমস্ত ক্ষেত্রেই ওই একই আদর্শ পিছন থেকে চালিকাশক্তির কাজ করে।

সৌন্দর্যকে তাই বিবেকানন্দের মতে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে এটি এক পারস্পরিক সম্পর্কের সমন্বয়সাধনের নীতি। শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং মানুষের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই এর প্রকাশ। ঐক্যমতের যে নীতি পূর্ব হতে অনুমিত তা সব সন্দেহের উর্ধ্বে, অর্থাৎ ভালোবাসার মৌলিক দৃশ্যময়তা যার দ্বারা সব কিছুকেই জয় করা সম্ভব। স্বামীজি ভালোবাসাকে বলেছেন এক ত্রিভুজের প্রতীক যার মধ্যে প্রথম কোণটি হল 'ভালোবাসা প্রশ্ন করে না।' এটি কোনোদিন ভিক্ষা চায় না; বরং সব সময়েই দান করে। দ্বিতীয় কোণটি হল : 'ভালোবাসা ভয় করে না।' ভয় বস্তুটি এর অজানা; তাই সে শুধু সবকিছু জয় করতেই জানে। তৃতীয় কোণটি হল : 'ভালোবাসার পরিসমাপ্তি ভালোবাসাতেই।' সুতরাং সৌন্দর্য হল মানুষের সমুদ্রযাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য যা এগিয়ে চলে এক ভালোবাসার মন নিয়ে; আর তাই এই সৌন্দর্যের সমুদ্রযাত্রাকে বর্ণনা করা যেতে পারে এই ঈশ্বরিক বিজয় হিসেবে কারণ এটি যাত্রা করে মৌলিক ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য যা প্রকৃতির সব কিছুকে এমনকি মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করে এমনটাই অনুমিত।

৭

বিবেকানন্দের কাছে ভালোবাসা হল এক সৌন্দর্য বিষয়ক বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু—যেটি এই ভাবনার প্রকাশ ঘটায় যে প্রচণ্ড শক্তিমত্তা ও কোমলতা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এই উপায়ে গোটা ব্যাপারটিকে অনুধাবন করে, ভালোবাসার এক উদাহরণ হিসেবে, তিনি উল্লেখ করেছেন একটি মেষ ও এক সিংহমূর্তিকে যারা একে অপরের গা চেটে দিচ্ছে এবং এই ছবিটিকেই তিনি প্রস্তাবিত রামকৃষ্ণ মন্দির এবং প্রার্থনাকক্ষের বাড়িটির দরজার দুদিকে এঁকে রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন : 'প্রস্তাবিত এই ভাবী মন্দির ও মঠ বাড়িটিতে আমার ইচ্ছে আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পের যা কিছু ভালো তাদের সহাবস্থান ঘটানো। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে, সারা পৃথিবী ভ্রমণকালে, যত সমৃদ্ধ ভাবনা চিন্তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেগুলির সবই আমি বাড়িটি নির্মাণের সময় প্রয়োগ করার চেষ্টা করব... এর দেয়ালগুলিতে থাকবে শত শত প্রস্ফুটিত পদ্ম... মন্দিরের মধ্যে রাজহংসের ওপর আসীন শ্রীরামকৃষ্ণের এক মূর্তি থাকবে... এটা আমার মত যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এ দেশের সমস্ত রকম শিল্প ও সংস্কৃতির শাখা প্রশাখাদের প্রাণবন্ত

করতেই...'

স্বামীজি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, যে-কোনোরকম সত্যিকার শিল্পকর্ম তোমার জড়বাদী পৃথিবীকে ভুলিয়ে দিয়ে এক নতুন আদর্শের পৃথিবীতে তোমার উত্তরণ ঘটাবেই। সুতরাং এর সঙ্গে আমরা এটিও যোগ করতে পারি যে সেই নতুন পৃথিবীটি অবশেষে হবে এক আধ্যাত্মিক ঐক্যের পৃথিবী।

৮

স্বামী বিবেকানন্দ নকল করা শিল্পকে ভীষণভাবে নিন্দার্হ বলে ভাবতেন। তিনি বলেছেন গ্রিসীয় শিল্পের মূল রহস্যই হল প্রকৃতিকে নকল করা, এমনকি খুঁটিনাটি পর্যন্ত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের রহস্য রয়েছে আদর্শবাদকে প্রতিবেদিত করার মধ্যে যা চিরন্তন এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। স্বামীজির মতে সত্যকার শিল্পকে তুলনা করা যেতে পারে একটি পদ্মফুলের সঙ্গে যেটি উদ্‌গত হয় মাটি থেকে, খাদ্য ও পুষ্টি লাভ করে মাটি থেকে, মাটিরই সংস্পর্শে থাকে, তথাপি ওর অবস্থান মাটির অনেক ওপরে। সুতরাং শিল্পকেও অতি অবশ্যই প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকতে হবে যেমন, তেমনি তাকে অবশ্যই প্রকৃতির অনেক ওপরেও থাকতে হবে। তিনি আমাদের সাবধান করে বলেছেন যে, যেখানেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, সেখানেই শিল্পকর্ম অধঃপতিত হবে সংক্ষেপে, শিল্প হল সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার অবস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। এমনকি বস্তুর সৌন্দর্যের মূল্যমান একান্তভাবে নির্ভরশীল তার ওপর যে কীভাবে সেটি আদর্শগত ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করতে পারছে।

এইভাবেই শিল্পকর্ম কোনো নকলনবিশি নয়, বরং সেটি এক সৃষ্টিধর্মী প্রকাশ। এটি এক সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রকাশ, সকলকে আলিঙ্গনের শক্তি, প্রথমে মানুষের ভালোবাসাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের মাধ্যমে যা বিজয়ীর মতো সমস্ত বিদ্বেষের বাধাকে ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে অতিক্রম করে এবং অবশেষে সমাপ্ত হয় মানবতা এবং স্বর্গীয় অনুভূতির উপলব্ধিতে।

বিবেকানন্দ বলেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শিল্পীসুলভ ধীশক্তি চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এবং স্বামীজির কথা অনুযায়ী উনি প্রায়শই বলতেন যে, 'ধীশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কেউই সত্যকার আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে পারে না।' স্বামী বিবেকানন্দের 'আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবাদের' মূল ধারণাটা যে কী সেটাই আমি এখানে বর্ণনা করার প্রচেষ্টা করেছি।

স্বামীজি বলেছেন যে, জাপান এক মহান দেশ এবং এ দেশের মহানতার বেশির ভাগটাই নিহিত তার শিল্পের উৎকর্ষতায়। জাপানিরা হল এশিয়ান এবং তারা প্রায়

সমস্ত জিনিসই ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে নিলেও শুধুমাত্র শিল্পের জন্য তারা জাপানিই রয়ে গেছে। বিবেকানন্দ এটি বলতেও দ্বিরুক্তি করেননি যে, চরিত্রগতভাবে এশিয়ান বলেই জাপানিজ শিল্প ওইরকম বিশাল সফলতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এশিয়ানদের আত্মাই যে শিল্পের সঙ্গে ঘন-সংযুক্ত। যে জিনিসের মধ্যে শিল্পের অস্তিত্ব নেই সে জিনিস এশিয়ানরা ভুলেও ব্যবহার করে না। এশিয়ানদের কাছে শিল্প হল বস্তুতপক্ষে ধর্মেরই এক অংশ, যখন থেকে ইউরোপিয়ানরা এশিয়ার সংস্পর্শে এসেছে তখন থেকেই তারা তাদের শিল্পকে এশিয়ানদের জীবনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই উপযোগিতার সন্ধান করে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জায়গাতেই রয়েছে শিল্পের অবস্থান।

৯

স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবোধের ওপর তাঁর এক বিখ্যাত মন্তব্য হল যে, তিনি বলেছেন গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এসবই হল সুন্দর শিল্পকর্ম। এসবই হল চাক্ষুষ শিল্প যা প্রতিনিধিত্ব করে একজনের নিজস্ব অনুভূত আদর্শকে যা মুক্তিপ্রাপ্ত বাস্তব এবং যা বেরিয়ে আসে স্বার্থপর বিচ্ছিন্নতাবাদের কলঙ্কিত পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু গানবাজনা, যা গেয়ে শোনাতে বা বাজিয়ে শোনাতে হয়, সেগুলি হল বিবেকানন্দের মতে সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের শিল্প; এবং যারা এর মর্ম বোঝে তাদের কাছে গানবাজনা হল সর্বোচ্চ সাধনার নামান্তর।

শিল্পরূপে ধরলে, গানবাজনা হল সবচেয়ে বেশি বিমূর্ত, কারণ এগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ব্যাপ্তিশীল। বিবেকানন্দের মতে, মানুষের সৌন্দর্যের সমুদ্রযাত্রা হল মূর্ত থেকে বিমূর্তে উত্তরণ; গানবাজনার বিমূর্ত হবার কারণে স্বামীজি মনে করতেন এটিই হল যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। চাক্ষুষ শিল্পকর্মগুলিকে বুঝতে পারা যায় প্রধানত তাদের ক্ষেত্রে অবস্থানের জন্য, সেজন্য ওই অবধি তারা মূর্ত। কিন্তু গানবাজনা প্রধানত উপলব্ধির, সুতরাং তারা বিমূর্ত। গানবাজনার মধ্যে এই যে উপলব্ধির ব্যাপারটি রয়েছে সেটি মানুষকে প্ররোচিত করে তার আদর্শকে খুঁজতে এবং তাকে উপলব্ধি করতে। আর এটি করতে লাগে চরমতম অভিনিবেশ শিল্পীর দক্ষতার প্রেক্ষিতে। এই চরমতম অভিনিবেশের প্রয়োজনীয়তার জন্যই বিবেকানন্দ গানবাজনার সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মনে করতেন।

স্বামীজি বলেছেন, ঈশ্বরসাধনার ক্ষেত্রে বোধহয় সবচেয়ে বেশি সহায়কবস্তু হল গানবাজনা। গানবাজনার এমন এক প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে যা মুহূর্তের মধ্যে মনকে একাগ্র করে তুলতে পারে। এমনকি পশুরাও, যেমন কুকুর, বিড়াল, সিংহ এবং

সাপেরাও বাজনায় সম্মোহিত হয়ে পড়ে। গানের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষই পৃথিবীকে তার সপ্তসুরের স্বরলিপি এবং বিভিন্ন স্বরগ্রাম উপহার দিয়েছে। এসবই আমাদের কাছে ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালেরও কিছু আগে। কিন্তু এগুলি ইউরোপে প্রচলিত হয়েছে মাত্র একাদশ শতকে (সম্পূর্ণ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২)। ভারতীয় সংগীতে স্বরপ্রবাহের এই যে নিয়মিত উত্থানপতন সেটাই অত্যন্ত সুখশ্রাব্য। স্বামীজি বলেছেন যে, ফরাসিরাই প্রথম এই গুণটিকে ধরতে পারে এবং এর প্রশংসা করে এবং নিজেদের সংগীত বাদ্যে এটির প্রয়োগের প্রচেষ্টা করে। ফরাসিদের এটা করতে দেখে এখন গোটা ইউরোপই এই পদ্ধতি অনুসরণে সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে (রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩)। স্বামীজির মতে ধ্রুপদ ও খেয়াল হচ্ছে খুব সুন্দর গান, কারণ এগুলি বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু সত্যকার সংগীত আমরা কীর্তনের মধ্যেই একমাত্র পেতে পারি, কারণ এর মধ্যে উপলব্ধির ব্যাপারটি রয়ে গেছে (যেমনটি মথুরায় গাওয়া হয়)। স্বামীজি বলেছেন, উপলব্ধিই হচ্ছে আত্মা, সবকিছুর রহস্য। সাধারণ মানুষের গানের মধ্যেও আরও বহু ধরনের সংগীত আছে এবং তাদের একত্রে সংগৃহীত করা উচিত। ধ্রুপদ ইত্যাদির বিজ্ঞান যদি কীর্তনের মধ্যে ব্যবহার করা যায় তাহলে সেটা হবে আদর্শ ও খাঁটি সংগীত (রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪০৭) তবে টপ্পা জাতীয় গানের ব্যাপারে তিনি খুব একটা আশাবাদী ছিলেন না, কারণ এটি রাগাশ্রয়ী গান নয়, অর্থাৎ রাগের ব্যবহার এখানে বিশ্বস্তভাবে করা হয়নি।

বিবেকানন্দ বলেছেন সত্যকার ভারতীয় সংগীত রয়েছে ধ্রুপদ এবং কীর্তনের মধ্যে; অন্যান্য জাতীয় সংগীতগুলি ইসলামিক পদ্ধতিতে নানাভাবে সুরে ঢেউ খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে (রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৬২)। পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে স্বামীজি প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এটা বোঝা যায় যখন তিনি বলেন পাশ্চাত্য সংগীত অনেক এগিয়ে। পাশ্চাত্যবাসীদের সংগীতে যেমন করুণ রস আছে তেমনি আছে বীররস, অর্থাৎ যেমনটি থাকা উচিত। যদিও ভারতীয় সংগীত স্বরমাধুর্যের (রাগাশ্রয়ী) ওপরেই বেশি নজর দেয়, তা সত্ত্বেও এটিকে বীররসাত্বক করা যেতে পারে সঠিক স্বরলিপির মাধ্যমে এবং বাদ্যযন্ত্রদের সেই স্বরলিপির সুরে সুর মিলিয়ে।

স্বামীজির মতে, একটি বর্ণসংকর সংস্কৃতির প্রভাব ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যেতেই পারে, তা সেটি চিত্রাঙ্কন অথবা গানবাজনা যেখানেই হোক না কেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি দৃঢ় মতাবলম্বী ছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হল নিজেকে খুঁজে ফেরা সেই মানুষ, জন্মলগ্ন থেকেই যে এক শিল্পী। সেই মানুষটিকেই সমস্ত বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে যাতে দেশের প্রাচীন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিল্পীসত্তাকে রক্ষা করা যায়, যার মধ্যে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে অধ্যাত্মবাদের দর্শন বা আদর্শ। স্বামীজি উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর নারদকে (ভক্তির মহান শিক্ষাগুরু) যে কথা বলেছেন : 'আমার নিবাস স্বর্গে নয়, যোগীদের

হৃদয়ও আমার আবাসস্থল নয়, আমি থাকি সেইখানে যেখানে আমার ভক্তরা আমার প্রশংসার ভক্তিসংগীত গায়।' (রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯)।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এক শিল্পের দর্শন উপহার দিয়েছেন, যেটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে মানুষের আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা হিসেবে যা খুঁজে ফেরে আনন্দকে। প্রতিটি মানুষই, তা সে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য যেখানকারই হোক না কেন, অন্তরে অন্তরে সে একজন শিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রচ্ছন্ন দেবত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে চলেছে। তার শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে, সে শুধু ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ চেতনা বা বোধের প্রগতিশীল উপলব্ধিদের উন্মোচিত করছে, যেটি হল মূর্ত হতে বিমূর্তের প্রতি যাত্রা এবং এভাবেই চরম বিমূর্ততার কাছে পৌঁছোনো, অমরাত্মা যা সর্বত্র বিদ্যমান এবং উপস্থিত, যা হল সমস্ত অস্তিত্বের ঐক্য—সচ্চিদানন্দ। মানুষের শিল্পসৃষ্টির উন্নতি নির্ভর করে তার উপলব্ধির ক্ষমতার ওপর এবং স্বর্গীয় স্পর্শটিকে খুঁজে ফেরার আকাঙ্ক্ষার ওপর যে দুটিকে তার কোনোদিনই হারানো চলবে না।

বিবেকানন্দ বলতেন যে শিল্প হল ঘনীভূত ও শোধিত আকারে নিজেকে প্রকাশ করা; এটি মানুষের নিজের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে বাক্যালাপের এক জমাট বাঁধা প্রতিরূপ। মানুষ শুধু কাজই করে না; সে সৃষ্টিও করে চলেছে; সে নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, তার নিজের ভবিষ্যতের স্থপতি। শিল্পসৃষ্টির অনুপমতা নিহিত থাকে মানুষের আত্মোপলব্ধির মধ্যে এবং তার চিরন্তন খুঁজে ফেরার মধ্যে যা এমন এক ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত-বাস্তব যাকে তার লব্ধ জ্ঞানই ক্ষমতা অনুযায়ী দিতে পারে। শিল্পীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল তার নিজেরই সৃষ্টি যেটি তার সামাজিক ও ধার্মিক ব্রহ্মাণ্ডের চেনা গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। সৌন্দর্য এক বিশ্বজনীন মূল্যের বস্তু যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছেই প্রাসঙ্গিক এতটাই যে বলা যেতে পারে এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায় মানুষের শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। শিল্প থাকে জীবনের মধ্যেই এবং কল্পনাপ্রবণ ও স্রষ্টা হবার সুবাদে মানুষ যেন নিজেকেও ছাড়িয়ে যায়। মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে এক আত্মসচেতন উর্ধ্বতন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে যেটি যেভাবেই হোক না কেন একটি দেহের মধ্যে স্থিত থাকে ইহজগৎ ও শূন্যতা সম্পর্কে কিছু নির্দেশ পেয়ে। এবং এই ইহজগৎ ও শূন্যতা সম্পর্কে নির্দেশ যেটি আকস্মিকভাবে শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্যে আসে সেটির গুরুত্বকে বলা যেতে পারে গৌণ যদি সেটিকে ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শের আঙ্গিকে বিচার করা যায় এবং যেটি প্রকাশ পায় চরমতম পরোৎকর্ষতায়।

সুতরাং, শিল্প হল শুধুমাত্র একটি আদর্শের প্রকাশ নয়, এটি একইসঙ্গে সৌন্দর্যেরও সৃষ্টি করে যার এক বিশ্বজনীন আবেদনও রয়েছে। অবশ্য শিল্পীকে, এক প্রচ্ছন্নভাবে স্বর্গীয় মানব হিসেবে, তার শিল্পসৃষ্টির কাছে কিছু সৌন্দর্যভিত্তিক নিয়মনীতি পালন করেই চলতে হবে। কিন্তু সেইসব নিয়মনীতিগুলি শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রারম্ভিক নির্দেশিকা হিসেবেই। শিল্পীর অবশ্যই স্বাধীনতা রয়েছে সেইসব নির্দেশিকাগুলিকে পরিবর্তন করার যদি তার শিল্পীসত্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে নতুন কোনো পথের সন্ধান দেয়, যার সম্পর্কে পূর্বে সে আদৌ অবহিত ছিল না। এখানেই রয়ে গেছে ভারতীয় শিল্পের স্বায়ত্তশাসন, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগীতের পূর্বপ্রস্তুতিহীন পল্লবিত বিস্তারে। এই পূর্বপ্রস্তুতিহীন বিস্তারের ব্যাপারটি চাক্ষুষ শিল্পের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান যেখানে শিল্পী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে তার কল্পনার অদম্য কিছু নির্দেশ অনুসারে যেগুলি স্ব-আরোপিত, এবং গৃহীত প্রথাগত রীতিনীতি অনুযায়ী পারতপক্ষে উপযুক্ত নয়। এভাবেই ভারতীয় শিল্প সবসময়ই একজনের স্বজনশীলতাকে উন্মোচিত করার কাজে ব্যাপৃত যাকে শুধুমাত্র অনুসরণ না করে ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এটাই ভারতীয় শিল্পের বিজয় সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববার্তা।

'সৌন্দর্য' কোনো ভাসমান সত্তা নয়; সমস্ত ক্ষেত্রেই এটি উপস্থিত। এটিকে উপলব্ধি করার জন্য পারমার্থিক দৃষ্টি শুধু প্রয়োজন এবং তারপর প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক কোনো উত্তাপের ওপর এটিকে প্রদর্শন করা দরকার, কিন্তু অবশেষে মানবাত্মার ওপর, তার অন্তর্নিহিত সহজাত অনুভূতি। পরবর্তী প্রদর্শনের ক্ষেত্রটি সত্যই এক আবিষ্কারের ঘটনা অথবা অতি-প্রাকৃতিক সত্যের প্রকাশ।

বত্রিশ সিংহাসন ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

বত্রিশ সিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি জাতীয় কাহিনিমালা এদেশে সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত। পরবর্তীকালেও অনেকে লিখেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্ভবত এই কাহিনি 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' থেকেই অনুবাদ করেন। ফারসি ভাষার চিহ্ন থাকাও অসম্ভব নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রচেষ্টা ছিল মূলত বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের সাহায্যে মার্জনা করে গড়ে তোলা। এই বইয়ের ভাষা খুব কঠিন সংস্কৃতপ্রধান না হলেও দীর্ঘ ও জটিল বাক্যবিন্যাস এই বইয়ে আছে, যদিও মোটের ওপর এই বইটি ওঁর শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্মের নিদর্শন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন মহানগর থেকে এর একটি ছাপা সংস্করণও প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় সেকালের মিশনারিদের চোখে ছিলেন দেহে ও বিদ্যায় ড. জনসনের সমতুল—'A colossus of literature,' আর তাঁদের মতে 'His knowledge of the classics was unrevalled, and his Bengali composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour,' (J.C. Marshman—The Life and Times of Carey, Marshman and Ward)। মৃত্যুঞ্জয় তৎকালের শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ না হলেও বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে প্রথম স্টাইলিস্ট রচয়িতা। এই 'বত্রিশ সিংহাসন' 'রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্মকাণ্ড ও চরিত্রচিত্রণ' হিসেবেও পরিচিত ছিল।

এই বইয়ের আখ্যাপত্রে আছে 'শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ, বাঙ্গালা ভাষাতে মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মন দ্বারা রচিত।' পরবর্তীতে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমানে আমরা সেখান থেকেই আলোচনা করব। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর সামনে গদ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। তাঁদের গদ্যচর্চায় কোনো আন্তরিক প্রেরণা ছিল না, চাকুরিজীবনে কেরি সাহেবের নির্দেশ ছিল একমাত্র সম্বল। শ্রীরামপুর ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর সুষ্ঠু গদ্যরচনায় প্রধান বাধা ছিল তিনটি—'১) শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, (২) দুরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশ সমূহে পারস্পরিক

সম্বন্ধবোধে অনিশ্চয়তা, (৩) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য নিরূপণে সুমিতিহীনতা।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, খণ্ড-২, অধ্যায় ১)।

'বত্রিশ সিংহাসন'-এর ভূমিকায় আছে 'সিবিলিয়ানদিগের ভাষাশিক্ষার জন্য লন্ডননগরে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন—'বত্রিশ সিংহাসন'-এর ভাষা আবার নীরস কর্কশ এবং আকর্ষণীশক্তিশূন্য। ফলত, এই গ্রন্থ অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, অতীব মধুর ভাবাপন্ন এবং অতীব আকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট। গ্রন্থখানি গল্পের আকারে গ্রথিত, পড়িবার সময় মনে হয়, যেন কোনও উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করিতেছি। ...বীর, করুণ, হাস্য—গ্রন্থখানি সকল রসেরই সারভূত। আদিরসও ইহাতে প্রচুর আছে। গ্রন্থখানি যেন সর্ব্বরসের আধার।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা যুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহনের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকায় সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজরাজার অধিকারের সময় ওই সিংহাসন প্রকাশিত হয়। ভোজরাজা ওই সিংহাসনে আরোহণ করিবার যে যে দিন স্থির করেন সেই সেই দিনে এক একটি পুত্তলিকা এক একটি গল্প করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক পুত্তলিকা মনোহর গল্পচ্ছলে রাজাকে বলে যে—'এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে এই সিংহাসনে আরোহণ করা কর্তব্য নহে; তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন; তাই এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়া ছিলেন। আপনার সেই যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া পরিশেষে এই সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।' 'ভোজরাজা বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি গল্প শ্রবণ করিয়া, সিংহাসনাধিরোহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সেই বত্রিশটি মনোহর গল্পরত্নে এই গ্রন্থ সমলঙ্কৃত পাঠক আধুনিক উপন্যাস পাঠে যে রস দেখিতে পাইবেন না, সে রস ইহাতে প্রচুর দেখিবেন। (বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড প্রকাশিত সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য)।' মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল, কিন্তু পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়, যেমন—'দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বন্ধবার নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দিকে পরিখা করিয়া তলে শাল-তাল-তমাল-পিয়াল হিন্তাল-বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুথী জাতী সেবতী কদলী আর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।' এখানে ক্রিয়াপদে 'আছে'র পরিবর্তে 'থাকে' ব্যবহৃত হওয়ায় আড়ষ্টতা কিছুটা আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী বই 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), যা গোলোকনাথ শর্মার একই নামে

বইয়ের পরে প্রকাশিত, যদিও তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি হলেও ওজস্বিতায় তা অনেক উচ্চগুণসম্পন্ন। ওই বছরেই ভারতের ইতিহাস রচনায় গল্পকাহিনিভিত্তিক লেখা 'রাজাবলী' (১৮০৮) তিনি লিখেছেন। এটিই বাঙালির রচিত প্রথম ইতিহাস প্রচেষ্টা, আরম্ভ হয়েছে চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান রাজা 'বিচিত্রবীর্য'-এর থেকে, সমাপ্ত হয়েছে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠায়। ইতিহাসের বিরাটত্ব মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় না এলেও হিন্দুযুগের বিবরণের ভাষা মূলত সংস্কৃতপ্রধান, কিন্তু সুলতান বাদশাহের আমলে পৌঁছে সেই ভাষাই আবার যথেচ্ছ 'পারশী মিশেল' বাংলাভাষা।

যেমন—'এই রূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লব বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্যন্ত বরাবর কোম্পানি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন।'

ভাষায় 'পর্যন্ত' বরাবর এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার গতিকে ব্যাহত করে আবার পারশি বিদেশি শব্দ 'খেদমত' 'গুজারি' ইত্যাদি অনায়াসে ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তব্য সামান্য হলেও লেখকের নিজস্ব লিখনভঙ্গিটি অনায়াস লক্ষ্য। পরবর্তী বই 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ১৮১৩ খ্রি. লিখিত ও ১৮৩৩ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এই বই সাধু গদ্যরীতির এক নিদর্শন হিসেবেই চিহ্নিত এবং বাংলার বহু মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। অনেকে বলেন যে মৃত্যুঞ্জয় নাকি ১৮০৭-১৮০৮ খ্রি. একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন, যদিও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং উইলিয়াম কেরির ব্যাকরণ রচনার তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন তা বোঝা যায়। ইংরেজি বিশেষ না জানলেও বিদ্যালঙ্কার কেরি প্রমুখের সময়কার ও পরবর্তী বাংলা গদ্যের পথপ্রদর্শক।

এমনকি রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্যরূপে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামক একটি বই লিখেছিলেন যেখানে তিনি বাংলার প্রাচীন সতীদাহ প্রথার সমালোচনা করে প্রকৃত শাস্ত্রীয় অনুমোদন দানে অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে রক্ষণশীল হলেও মৃত্যুঞ্জয় আধুনিক মনস্কতার পরিচয়ও রেখেছেন। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিত্যাগ করে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জর্জ-পণ্ডিত হিসেবেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও মুনশিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্য কোন পথে চালিত হবে, বিদ্যালঙ্কার তাঁর বহু প্রয়াস করে গেছেন। যদিও অনেকটা দায়ে পড়েই তিনি এই কাজে হাত দিয়েছেন। বাংলার স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য পরবর্তীকালে কিছুদিন থাকলেও তিনিই বাংলায় অনুবাদ মূলক পাঠ্যপুস্তকের সার্থক চেহারা এবং রীতিনির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের আগে মৃত্যুঞ্জয়ই অন্যতম (School mene's method) অবলম্বন করে গ্রন্থরচনায় পাইওনিয়ার বা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন। এই

বত্রিশ সিংহাসন সম্পর্কে Dr. Susil Kr. De তাঁর 'History of Bengali Literature' বইয়ে লিখেছেন—'Batris Simhasan is a close translation in plain simple Bengali of very popular and well known Sanskrit work which is some times supposed to be of Buddhistic origin, sometimes attributed to no less a writer than Kalidasa. The title literally means the thirty two thrones but it should rathar the thirty two images of Bikrammaditya's throne. The earlier style of Mrityunjay, as displayed in this work, if not superior to that of some of his contemporaries, was certainly less affected and pedantic than his later style, although some what sanscritised.' (page, 204, published by University of Calcutta 1919 A.D.)

উন্মেষপর্বের নাট্যচর্চায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাঙালি খ্রিস্টান যশোরের সাগরদাঁড়ির রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়তে পড়তে খ্রিস্টধর্ম নেওয়ায় কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসনের ভাবপ্রেরণায় রক্তে বাঙালি কিন্তু মনেপ্রাণে ইংরেজ হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীতে মাদ্রাজে থাকাকালে 'মাদ্রাজ স্পেকটেটর' পত্রিকায় কর্মকালীন 'A Vision of the Past-Sultana Rizia' এবং 'Captive Ladie' লেখেন। একটি নাট্যধর্মী, অপরটি কাব্যধর্মী।

তারপরে স্বপ্নভঙ্গ 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু' হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন এবং ড্রিংকওয়াটার বেথুন, বন্ধু গৌরদাস বসাক প্রমুখের তাড়নায় বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। প্রথম নাট্যানুবাদে হস্তক্ষেপ গৌরদাসের সুপারিশে। স্থান হল পাইকপাড়ার নাট্যমোদী রাজপরিবারে। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রমুখের অনুরোধে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে মনে জাগল 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়,' জাতীয় চিন্তায় মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এই নাটকের প্রস্তুতি বাল্যে মায়ের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়।

পূর্বে উল্লিখিত বেথুন সাহেবের হিতোপদেশের অংশবিশেষ—'But he could tender for greater service to his country and have a better chance of having a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in proving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.' যদিও বেথুনের উপদেশের আগেই ফেব্রুয়ারি, ১৫, ১৮৪৯ খ্রি. মধুসূদন সহসা গৌরদাসকে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ, যে মধুসূদন 'I sigh for Albian's distant shore' লিখেছিলেন, তিনিই আশাহত হয়ে বাংলা রচনায়

ফিরেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যালয় সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ে লিখেছেন—'এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল।'

শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) : মহাভারতের আদিপর্ব থেকে শর্মিষ্ঠার কাহিনি নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের মতে এই নাটকের অশুদ্ধ অংশ চিহ্নিত করতে অনুরোধ করলে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন যে 'এতে দাগ দিতে গেলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে। এটি একেবারে অচল।' পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের বেলগাছিয়া উদ্যানে নবরঙ্গমঞ্চের উদ্‌বোধনে প্রচুর শ্বেতাঙ্গ দর্শককে আমন্ত্রণ জানান। উদ্‌বোধনি দিনে রাজনারায়ণ বসু অনূদিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের বিষয়বস্তু সাহেবদের কাছে তুলে ধরার জন্য গৌরদাস বসাককে অনুরোধ করলে মধুসূদনের প্রবেশ। তর্করত্নের নাটকের অনুবাদে আড়ষ্টভাব ও আরও নানারকম দুর্বলতা দেখে নিজেই নাটক লিখতে মনস্থ করেন। তখন তাঁর কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পড়া ছিল। শর্মিষ্ঠা রচনার প্রস্তুতি হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিছু বাংলা ও সংস্কৃত বই আনানো হয়েছিল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে এটি মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ ও ওই বছর বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়। এরপর মাত্র তিন বছরে বাংলা নাটক নিয়ে মধুসূদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা নাটককে কয়েক যুগ এগিয়ে দিয়েছিল।

মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল 'This Sharmistha has every nearly put me at the head of all Bengali writers.' 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাট্যকারের কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—'আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাংলা নাটক এ পর্যন্ত প্র্যাকটিস হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন সন্দেহ নাই।'

শর্মিষ্ঠার প্রথম অঙ্কর প্রথম গর্ভাঙ্কে দৈত্য সেনাপতি বরাসুর ও যোদ্ধৃবেশধারী দৈত্যের কথোপকথনের মাধ্যমে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর স্নেহ, শর্মিষ্ঠা কর্তৃক দেবযানীকে কুয়োর মধ্যে নিক্ষেপ, সংবাদ পেয়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ক্রোধ, পরিশেষে শর্মিষ্ঠার দাসিত্ব অংশে বর্ণিত। দ্বিতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার মনোবেদনা, যযাতির প্রতি দেবযানীর পূর্বরাগ, সখী পূর্ণিমা কর্তৃক এই সংবাদদান বর্ণিত। কুয়ো থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন যযাতি।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দুই নাগরিকের কথোপকথনে আছে...'কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল।' দেবযানীকে দেখে মুগ্ধ রাজার উক্তি—'পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া; হায় বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া।'

রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনে আছে, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ সংবাদ, তৃতীয় অঙ্কে প্রকৃত নাট্যদ্বন্দ্বের সূচনা। এখানে দেবযানীকে বিয়ে করে দেড় বছর পরে রাজা বিদূষকের কাছে শর্মিষ্ঠার প্রতি তাঁরা আকর্ষণের কথা বলেছেন—'স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রীতি ভ্রমে তাকে পূজা করেছেন।' চতুর্থ অঙ্কে বাস্তবিক সমস্যা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। শর্মিষ্ঠা-যযাতি সম্পর্ক জেনে দেবযানী উভয়কে ভর্ৎসনা করে গৃহত্যাগ করার পর শুক্রাচার্য যযাতিকে জরাগ্রস্তের অভিশাপ দিলেন। যযাতির ব্যাকুলতা—'যে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাব।' পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যযাতিপুত্র পুরু জরা গ্রহণ করলে তাঁর বিপদের অবসান। নাট্যসমস্যার সমাধান ঘটল এরপর শুক্রাচার্যের নির্দেশে দেবযানী-শর্মিষ্ঠার মিলন ও রাজা দুজনকেই গ্রহণ করলেন। যযাতির ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, অস্থিরতা নাটকে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

নাটকের প্রয়োজনে মধুসূদন মূল কাহিনির কিছু পরিবর্তন করেছেন। যযাতি, দেবযানী, শুক্রাচার্য ইত্যাদি চরিত্রে ছোটোখাটো ত্রুটি থাকলেও চরিত্রগুলি অনেকাংশে স্বাভাবিক। শর্মিষ্ঠা তো বাঙালি রমণী হয়ে উঠেছেন। পাশ্চাত্য রীতিতে পঞ্চাঙ্ক নাটক শেকসপিয়রীয় পঞ্চসন্ধি মেনে চলার চেষ্টা। সংলাপ বিদ্যাসাগরীয় সাধু গদ্যে হওয়ায় অনেক জায়গায় শ্লথ ও আড়ষ্ট। সংস্কৃতানুগ দীর্ঘ সংলাপ অনেক জায়গায় নাটকের গতি রুদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও এটি বাংলায় লেখা প্রথম সার্থক মৌলিক নাটক।

পদ্মাবতী (১৮৬০ খ্রি.) : মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গ্রিক পুরাণের কাহিনিকে ভারতীয় পুরাণের আদলে ঢেলে এই দ্বিতীয় নাটক লিখেছিলেন। এই নাটক প্রকাশের পর এটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি—১৮৬৫ খ্রি. পাথুরিয়াঘাটার এক ধনীর বাসভবনে প্রথম অভিনীত হয়।

'পদ্মাবতী' নাটকের বিষয়বস্তু 'Apple of Discord' অবলম্বনে রচিত। এই কাহিনিতে কলহপ্রিয়া গ্রিক দেবী ডিমকার্ডিয়া একবার একটি সোনার আপেল তৈরি করে তাঁর গায়ে 'সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য' লিখে জুনো, পালাস ও ভেনাস নাম্মী তিনজন গ্রিক দেবীর মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। এই আপেল নিয়েই তাঁদের মধ্যে বেধেছে দ্বন্দ্ব—ট্রয়ের রাজপুত্রকে তাঁরা মধ্যস্থ মানলেন। উনি ভেনাসকেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে ঘোষণা করলেন। জুনো, প্যালাস ও ভেনাসের বিবাদে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল—এখানে তাঁদেরই আদলে নাট্যকার ভারতীয় পুরাণের তিন দেবীকে সৃষ্টি করেছেন। জুনো হয়েছেন ইন্দ্রাণী শচী, প্যালাস হয়েছেন মুরজা ও ভেনাস হয়েছেন রতি। গ্রিক বাহিনীর নায়ক প্যারিস ভেনাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরূপে অভিহিত করে হেলেনকে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। আর এই পদ্মাবতী নাটকে ইন্দ্রনীল রতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে পদ্মাবতীকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিলেন। এই

নাটকের শেষে কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের গঠনরীতির প্রভাবও রয়েছে বলে 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন জানিয়েছেন। যেমন এটির তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষের দিকে পদ্মাবতী সখীকে বলেছেন—'সখী। দেখ এই নূতন তৃণাঙ্কুর, আমার পায়ে বাজতে লাগল। উঁহু! আমি ত আর চলতে পারি না।'

নাট্যসূচনাতে দেখা যায় যে, তিনজন দেবীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের প্রথম কথোপকথনের সময় রতির প্রতি ইন্দ্রনীলের বিশেষ মনোভাব শচীর ক্রোধের কারণ ঘটিয়েছে। রতি চেয়েছেন তাঁকে তাঁর পুরস্কারস্বরূপ পদ্মাবতীর সঙ্গে মিলন ঘটাতে আর শচী চেয়েছেন তাঁদের সর্বনাশ সাধন করতে। ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর প্রাসাদে এসে ইন্দ্রনীল ধরা পড়ে যান। অবশ্য পদ্মাবতীকে রাজার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে সমস্যাকে জটিল করে তুলেছেন। শেষে ঋষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতী-ইন্দ্রনীলের মিলন ঘটেছে। রতি-শচীর বিরোধেরও অবসান ঘটেছে। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের সংলাপ রচনায়ও মধুসূদন কিছু কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইন্দ্রনীলের রচয়িতা যে নায়িকার বিস্ময় ও উদ্‌বেগ উৎপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন তাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। শচীর সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় যে, সে রানির মারফত পদ্মাবতীকে সংবাদ পাঠিয়েছে যে, রাজা ইন্দ্রনীল তাঁকে এই আদেশ করেছেন যে তিনি যেন কিছুকালের জন্য 'রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্বতের দুর্গে গিয়ে থাকেন।' সারথিরূপী কলির মুখে রাজার এই অকারণ এবং অবিশ্বাস্য আদেশ শুনেও পদ্মাবতী রাজপুরী পরিত্যাগ করলেন—'আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো আমার এই কথাগুলিই আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও।' সাহিত্যের ইতিহাসের বইয়ে ড. সুকুমার সেন তাই বলেন পদ্মাবতী নাটক পুরোপুরি গল্পসর্বস্ব, এই নাটকের বস্তুবিন্যাসে কোনো শৈথিল্য নেই। 'পদ্মাবতী' নাটকে 'শর্মিষ্ঠা'র অনেক ত্রুটির সংশোধন লক্ষ করা যায়। এই নাটকেই মধুসূদন কলির উক্তিতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন পরীক্ষামূলকভাবে—

'কলি, পালিনু তোমার আজ্ঞা যজনে ইন্দ্রাণী
বিদায় করহ তবে যাই স্বর্গপুরে।'

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রি.) এই নাটকটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রচিত এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত। এই নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যদর্শন প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন নাট্যকার—ফলে পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে যে বাক্যময়তা ছিল তা এখানে প্রায় বর্জিত হয়েছে। দ্বন্দ্বমুখরতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই নাটকের রচনার অভিজ্ঞতা মধুসূদন অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন—'I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet.'

বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে এই নাটক রচনার প্রেরণা উল্লেখ করেছেন—'What a romantic tragedy it will make.' প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন কর্নেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' দু-রাত নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ে দ্বিতীয় রাতে ১টার সময় লেখার বিষয়বস্তু পেয়েছিলেন। অন্য পত্রে 'The story of Krishna through tragic, in barren of incidents'। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চেই এই ট্র্যাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিদিসের 'ইফিগেনিয়া অ্যাট তৌরিস'-এর ছায়ায় এটি রচিত। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাণা ভীমসিংহের মানসিক আলোড়নের সঙ্গে শেকসপিয়রের 'কিং লিয়ার' নাটকের মানসিক দ্বন্দ্বের সামান্য সাদৃশ্য আছে। যেমন ভীমসিংহের সংলাপ—'হে নিশাদেবী। এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ। বিলাপ কর। কৈ এখনও বজ্রাঘাত হল না? কৈ বিলম্ব কেন?'

লিয়ার বলেছেন—

'You Sulphrous and thought executing...
single my white head!
And thou, all shaking thunder,

নাটকের একটি চরিত্র মদনিকার পুরুষের ছদ্মবেশে উদয়পুরে অবস্থিতি ও ধনদাসকে প্রতারণা করা শেকসপিয়রেরই 'As you like it' নাটকের রোজালিন্ডকে স্মরণ করায়। এই নাটকে প্রাচ্য প্রভাবও কম নয়। নাটকে তপস্বিনীর নাম কপালকুণ্ডলা রেখেছেন ভবভূতির 'মালতী-মাধব'-এর অনুসরণে। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—'কৃষ্ণকুমারী নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবত সংস্কৃত নাটক শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক'-এর মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন।' রাজকুমার কৃষ্ণার চরিত্রে শকুন্তলার প্রভাব আছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণা বলেছে—'আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বন বিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম।' নাটকের নায়ক বলা চলে কৃষ্ণার পিতা রাণা ভীমসিংহকে। কারণ doing ও suffering তাঁরই। তবে ভীমসিংহ প্রথম থেকেই অসহায় ও দুর্বলচিত্ত। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোনো একদেশদর্শিতা নেই। এমনকি বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামের প্রয়াসও নেই। শৈলরাজের বংশধর হয়েও মহারাষ্ট্রাধিপতির সঙ্গে অমর্যাদাকর সন্ধি করেছেন। সত্যদাস যখন প্রজাদের হিতের জন্য ও বংশের মানরক্ষার কারণে কৃষ্ণার আত্মবিসর্জনের প্রস্তাব দেন তখন রাণার মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবে মধুসূদন শেষপর্যন্ত রাণা ভীমসিংহকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাখায় রাণার ট্রাজেডির মর্মভেদী বেদনা তাঁকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। তবে নাটকে করুণরস রাজপরিবার থেকে সমস্ত রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জীবনে

বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববর্তী নাটকদ্বয়ের তুলনায় 'কৃষ্ণকুমারী'-র ভাষা অনেক সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও চরিত্রানুগ। কখনো- কখনো অলংকৃত ভাষার প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। যেমন রাণা ভীমসিংহের উক্তি—'কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে, তা এদেশেরও কি সেই দশা ঘটল।' চরিত্রচিত্রণেও এই নাটকে নাট্যকারের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। ভীমসিংহ কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে কুলের মর্যাদা ও অন্যদিকে জাতির কল্যাণসাধন এই উভয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসহায়ভাবে পরিস্থিতির সাক্ষী। অপরদিকে জগৎসিংহও বিপরীতধর্মী চরিত্র নয়। এই চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের উক্তি—'I have tried to represent Juggutsing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow.' আবার ধনদাসের অর্থলোলুপতা, চাতুর্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত। বলেন্দ্রসিংহ রাজভ্রাতা ও সেনাপতি। মধুসূদন তাঁকে শেকসপিয়রের 'King John' নাটকের বাস্টার্ড চরিত্রের আদলে গড়ে নিয়েছেন। নাটকের নায়িকা কৃষ্ণকুমারী। ইতিহাসের প্রেরণা থেকে নাট্যকার তাঁকে 'dignified yet gentle' রূপে আঁকতে চেয়েছেন। যা হোক মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নাটক।

মধুসূদনের তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে রচিত হলেও এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের শেষ দিকে। মৌলিক বাংলা নাটক। এটি বেলগাছিয়া রঙ্গশালা ছাড়া ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার নাট্যশালা ও পরে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ও ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই নাট্যাভিনয় সম্পর্কে ও নাটক সম্পর্কে লেখে—'কৃষ্ণকুমারী বাংলাভাষায় রচিত মৌলিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।'

এই তিনটি নাটক ছাড়া মধুসূদন দুটি চমৎকার প্রহসন লিখেছিলেন। প্রহসন দুটি হল 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। এই দুটিই ১৮৬০ খ্রি. প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে এই দুটি কখনও অভিনীত হয়নি। মূলত কবি মধুসূদন, যিনি বাংলা কাব্যে নতুনত্ব এনেছিলেন—সেই কবির বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর দুটি প্রহসন। বিদেশি 'ফার্স'-এর অনুকরণে এই দুটি লেখা হয়েছিল। যদিও দুটিই সামাজিক প্রহসন।

'একেই কি বলে সভ্যতা'-র বিষয় নব্য বঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্ধ বিদেশি অনুকরণে সামাজিক স্খলন-পতন। ডিরোজিও অনুগামীরা অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য বদভ্যাসগুলিও রপ্ত করতে চেয়েছেন। তারই প্রতিফলন এই প্রহসন। নবকুমার ও কালীনাথ এর প্রতিভূ। এই প্রহসন দুটির রচনার অনুপ্রেরণা পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মধুসুদনকে লিখিত পত্র। প্রহসনের ভাষা, সংলাপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত। দু-অঙ্ক ও চারটি গর্ভাঙ্কে এর কাহিনি বিন্যস্ত। কাহিনিতে ধারাবাহিকতার অভাব থাকলেও রচনা অত্যন্ত শক্তিশালী। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'

পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এ রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রহসনের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। প্রহসনে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার মাধ্যমে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রহসনে নারী চরিত্রও বেশ সাবলীল। যেমন প্রসন্নময়ী, হরকামিনী প্রমুখ। হরকামিনী বলেছে—'এমন স্বামী থাকলিই বা কি, আর না থাকলিই বা কি?' ওর মুখেই নব্যশিক্ষিত যুবদলের প্রতি ধিক্কারবাণী উচ্চারিত—'মদ মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?' মহেশ ও বলাই চরিত্র নবকুমার ও কালীনাথের কঠোর সমালোচক। জনৈক বৈষ্ণব চরিত্র সম্পর্কে কালীর সংলাপ—'বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়েছি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যে কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।'

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে প্রাচীন ধর্মধ্বজী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধ্বজাধারীদের শ্রেণিরূপকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম সংস্করণে এই প্রহসনের নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। এই প্রহসনটি পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হয়। ধর্মধ্বজী হিন্দুসমাজকে ব্যঙ্গ করায় পাইকপাড়ার রাজারা এটিকে মঞ্চস্থ করতে পারেননি। এই প্রহসনে প্রবীণ ভক্তপ্রসাদের মাধ্যমে মহাজনি কারবার, অর্থলোলুপতা ও কুমারী কুলকামিনীদের সর্বনাশসাধন প্রভৃতি চিত্রিত। মধুসূদনের জীবনচরিত লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু তাই লিখেছেন—'কেবল ইংরেজি শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, চরিত্রহীন বকধর্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কু-ব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণির কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালা জপ কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন তাঁহাদিগের নিত্য ব্রত ছিল।' প্রহসন দুটি অঙ্ক ও দুই গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। এই প্রহসনে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের বাইরে ও অন্তরের সামঞ্জস্যের অভাবকে উদ্‌ঘাটিত করে ব্যঙ্গ করেছেন। শেষপর্যন্ত ভক্তপ্রসাদের পরিণতির মধ্যে নাট্যকারের অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে। উপসংহারে তাই দেখা যায়—

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফললো ধর্ম,

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে অজিত কুমার ঘোষ সঠিকভাবেই বলেছেন— 'মধুসূদনের মানস কল্পনা সুগম্ভীর দূরাস্তৃত জগতে বিলাস করিতে চাহিত। সেজন্য তাঁহার কাব্য ও নাটকে প্রাত্যহিক জগতের পরিচিত ক্ষুদ্রতা নাই, অতীত জগতের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তাহা রহস্যালোকিত।' (সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৬৫)

যথার্থই কবি ও নাট্যকার হিসেবে মধুসূদন কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও নিজের শক্তিশালী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকে কিছু ত্রুটি আছে—(ক) মধুসূদন বলতেন ট্র্যাজেডি নাটকে কমিক প্রসঙ্গ রাখা ঠিক নয় যদিও নাট্যরস গাঢ় করার কারণে 'কমিক রিলিফ' ট্র্যাজেডিতে থাকতে পারে—কিন্তু মদনিকা-ধনদাস প্রসঙ্গে তা আছে। (খ) ট্র্যাজেডি নাটক হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিকতা ও অতি নাটকীয়তা কোনো কোনো অংশে আছে।

মধুসূদনের শেষ নাটক মায়াকানন (১৮৭৬ খ্রি.) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রচিত এই নাটক অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল—কিন্তু মধুসূদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন। এই নাটকটিও ট্র্যাজিকধর্মী। ইতিহাস ও পুরাণের মিশ্রণে এটি রচিত। পুরাকালে সুন্দরী রাজকন্যা ইন্দিরা রতিকে অবহেলা করায় রতির অভিশাপে তিনি মায়াকাননে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হন। রতি জানান যে তাঁর চেয়েও কোনো সুন্দরী তাঁর কাছে আত্মঘাতিনী হলে তাঁর মুক্তি ঘটবে অথবা কোনো পবিত্র কুমার-কুমারী ওই মূর্তির পুজো করলে তার মুক্তি ঘটবে। অজয় ও ইন্দুমতী ওই মূর্তির পুজো করে এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অরুন্ধতী নামে এক সন্ন্যাসিনী এদের বিয়েতে অমঙ্গল ঘটবে জানান। অজয়ের পরলোকগত পিতার প্রেতমূর্তিও বিয়ে বন্ধ করতে বলেন। গুর্জররাজ সসৈন্য এগিয়ে আসেন ইন্দুমতীকে পুত্রবধূ করার মানসে। নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য ইন্দুমতী অভিলাষী হয়ে ওঠে। ছুরির আঘাতে সে প্রাণ হারায় আর রাজা অজয়ও আত্মহত্যা করে। তখনই দেখা যায় সেই মায়াকাননের পাথরের মূর্তি ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। ইন্দিরা শাপমুক্ত হয়েছে। দৈববাণী থেকে জানা যায় তারা দুর্বাসার শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব।

'মায়াকানন' মধুসূদনের প্রতিভার সম্যক স্বাক্ষর নয়। শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রভাব থাকলেও কাহিনি শিথিল। সংলাপও সুপ্রযুক্ত নয়। অলৌকিকতার ছড়াছড়ি। যা হোক মধুসূদনের নাট্যকর্মের এখানেই সমাপ্তি।

সার্ধদ্বিশতবর্ষে 'ভারতপথিক' রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের জনক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 'ভারত-পথিক' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁর ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই গণজাগরণের পথপ্রদর্শক বা চক্ষু উন্মোচনকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ইতিহাসের তথ্য থেকে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার যথার্থই বলেছিলেন, 'তথ্য দিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়, কিন্তু সত্য কেবল ঘটনা থেকেই বিস্তৃত হয়, সত্যকে বাস্তব যুক্তি ও সত্যকল্পনার মাধ্যমে বের করতে হবে।' ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে রামমোহন রায়ের সত্য খুঁজে বের করার জন্য এটি সম্ভবত একমাত্র সত্য হতে পারে। তাঁকে আধুনিক ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। তিনি সমস্ত ধরনের সামাজিক গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং একজন বহুভাষী সংস্কারবাদী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সম্পর্কীয় একেশ্বরবাদী ধারণা প্রচার করেন, ১৮১৪ সালে আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে এটি ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (লর্ড আমহার্স্টের) গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলরের কাছে একটি চিঠি লেখেন যাতে সারাদেশে ইংরেজিকে জ্ঞানকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। তখন প্রাচ্যবিদ এবং অ্যাংলিসিস্টের একটি বড়ো বিতর্ক পিছনে চলেছিল, তাই ব্রিটিশ সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, তারা প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষে বা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে বার্ষিক অর্থব্যয় করবে। ডিসেম্বর ১৮২৩, রাজা রামমোহন রায় লিখেছেন, '...আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে ইতিমধ্যেই বর্তমানের মতো জ্ঞান দেওয়ার জন্য সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সেমিনারিটি কেবলমাত্র সমাজের জন্য সামান্য বা কোনও ব্যবহারিক বা শারীরিক বা মানসিক পার্থক্যের কোনো প্রয়াস করবে বলে আশা করা যেতে পারে...এই দেশকে অন্ধকারে রাখতে সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোত্তম গণনা করা

হবে'। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টের কাছে রায়ের ঐতিহাসিক চিঠি ভারতে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সূচনা করেছিল। ধারণার পাশাপাশি স্মৃতিচিহ্নের বাস্তবায়ন ছিল রামমোহন রায়ের নিজস্ব। মিস সোফিয়া ডবসন কোলেট স্মারকটি সম্পর্কে ন্যায়সংগতভাবে বলেছেন, 'এটিকে ভারতীয় ইতিহাসের অ্যারিওপ্যাজিটিকা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। একইভাবে কথা এবং যুক্তিতে, এটি প্রাচ্যে ইংরেজি সংস্কৃতির অগ্রগতিতে একটি মহৎ ল্যান্ডমার্ক গঠন করে।' ('দ্য লাইফ অ্যান্ড লেটারস অব রাজা রামমোহন রায়') শৈশব থেকেই রামমোহন দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে ব্যতিক্রমী ছিলেন। রামমোহন রায় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংস্কারবাদী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ভারতে সামাজিক রাজনৈতিক আধুনিকতার পথপ্রদর্শক। যদি আমরা ওপরে বর্ণিত মাপকাঠি ব্যবহার করি, ফিরদৌসির ইরানে বা কবির, নানক, চৈতন্য প্রমুখের ভারতে ১৫-১৬ শতকের আধ্যাত্মিক জাগরণের যুগগুলিকে খুব কমই নবজাগরণের সময় বলা যেতে পারে। অন্যদিকে রামমোহনের সময়ে পুনরুত্থান, অনুকূলভাবে তুলনা করে যদিও 'এটি বিষয়বস্তু এবং আকারে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঠিক অনুলিপি হতে পারেনি।' তবুও বেশ আবেগপ্রবণভাবে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্তি দিয়েছিলেন—'১৮ শতকে ভারতীয় রেনেসাঁর প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন দুটি মৌলিক ধারণা তৈরি করেছিলেন। যা ১৫ শতকের ইউরোপের গর্ভে অঙ্কুরিত হতে পারেনি; প্রথমত, তিনটি বিশ্ব ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং সংশ্লেষণ—হিন্দুধর্ম, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম। দ্বিতীয়ত, সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য সমর্থন'। যে-কোনো বিতর্ক বা তুলনার জন্য, আমাদেরকে 'রেনেসাঁ'কে একটি বিশেষ ধরনের মানব জাগরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপে নবজাগরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি যুক্তিসংগতভাবে ভালো প্রচেষ্টা করেছেন; সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষার একটি যৌক্তিক মূল্যায়ন, এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; পুণ্যময় কর্মের উপায় হিসেবে বস্তুগত অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিতকরণ; এই বিশ্বাস যে মানুষের বিবেক হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর এবং 'ঈশ্বরের পার্থিব এজেন্টদের' অপ্রয়োজনীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা; মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার দাবি; একটি আইন-শাসিত মহাবিশ্বে বিশ্বাস এবং যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ; নতুন সৃজনশীল শিল্প এবং সাহিত্যকর্মের বিকাশ; এবং সবশেষে শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া।

রাজা রামমোহন রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতের একটি গৌরবময় দিক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে লর্ড বেন্টিংক ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ভারতে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এই টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। বেন্টিংকের আগমনের

আগে স্কুল-কলেজে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিরাট বিতর্ক চলছিল। এটা কি ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে নাকি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে? হেইম্যান উইলসন এবং এইচ.টি. প্রিন্সেপ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের মতো ভারতীয় উদারপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যবাদীরা ইংরেজি ভাষার পক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কাউন্সিলের আইন সদস্য লর্ড মেকলে বিতর্কটিকে একটি নির্দিষ্ট আকার দেন। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ রাখা হয়েছিল তা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। মেকলের প্রস্তাবগুলি বেন্টিংক দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালের একটি রেজোলিউশনে মূর্ত হয়েছিল, যা ঘোষণা করেছিল যে, 'পরিষদে তাঁর লর্ডশিপের এই অভিমত যে, ব্রিটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্যটি স্থানীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচার হওয়া উচিত। ভারতের এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সমস্ত তহবিল শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য সর্বোত্তমভাবে নিযুক্ত করা হবে।' ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি ভাষাও সরকারি ভাষা হয়ে ওঠে এবং এটি ভারতের জনগণকে ধারণা বিনিময়ের জন্য সাহায্য করেছিল।

পূর্বে কলকাতার শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩-১৭৯৭) এবং তাঁর অনুগামীরা ১৮১৭ সালে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন শুরু করেছিলেন, রামমোহন রায় তাঁদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি ভগ্নহৃদয়ে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮১৫ সালের এক সন্ধ্যায় তাঁরা কয়েকজন বন্ধুরা মিলে পরামর্শ করছিলেন যে, দেশীয় মানুষের মনন ও চরিত্রের উন্নতির লক্ষ্যে কী করা উচিত, রামমোহন রায়ের অবস্থান ছিল যে, তাদের একটি সমাবেশ বা সমাবর্তন প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যেখানে বেদান্ত বা প্রাচীন হিন্দুধর্মের উচ্চতর বা বিশুদ্ধ মতবাদকে শেখানো যেতে পারে, সংক্ষেপে বেদ এবং তাঁদের উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ কিন্তু রামমোহন রায় যা আনতে পেরে আনন্দিত ছিলেন। একেশ্বরবাদের আরও জিনিয়াস শিরোনাম রামমোহন। মি. ডেভিড হেয়ার ছিলেন কলকাতার একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক, নিজে একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, 'কিন্তু একজন মহান স্ফূর্তিমান এবং শক্তিশালী ব্যবহারিক বোধের অধিকারী হওয়ায় তিনি বলেছিলেন যে, পরিকল্পনাটি দেশীয় যুবকদের শিক্ষার জন্য একটি ইংরেজি স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তদনুসারে তিনি শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেন, যা ধীরে ধীরে নেতৃস্থানীয় ইউরোপীয়দের এবং অন্যান্যদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রস্তাবিত পরিমাপটি বিবেচনা

করার জন্য পরিচালিত হওয়ার কারণে,তিনি আন্তরিকভাবে এতে প্রবেশ করেন এবং ১৮১৬ সালের মে মাসে ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের একটি সভা করেন। তিনি কিছু বুদ্ধিজীবী স্থানীয়কে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তারপর সর্বসম্মতিক্রমে সম্মত হয় যে, তাঁরা উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখানোর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করবেন, যাকে কলকাতার হিন্দু কলেজ হিসেবে মনোনীত করা হবে।' রামমোহন রায় চরিত্রগত শক্তির সঙ্গে কিন্তু একটি বিরল আত্ম-নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পে নিজেকে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু, স্বেচ্ছায় কমিটি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন, কারণ তাঁর ধর্মীয় মতামতের কারণে কিছু গোঁড়া হিন্দু নেতা এতে তাঁর সহকর্মী হতে আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'যা যদিও বাইরে থেকে তাঁর পক্ষে তাঁর উদ্যোগী পরিশ্রমকে প্রভাবিত করেনি।' রামমোহন সাবলীল ছিলেন মূলত সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ইত্যাদির মতো প্রায় বিদেশি এবং দেশীয় আটটি ভাষা ব্যবহার করায়। তিনি তৎকালীন কলকাতায় বেদান্ত স্কুল, ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড বেন্টিংকের বড়ো কৃতিত্ব ছিল তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ছিলেন ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। তাঁর আগে বাকি সবাই ইংল্যান্ডে ফেরার সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন; ১৮২৮ সালে বাংলার গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার আগে বেন্টিংক কয়েক বছর হাউস অফ কমন্সে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রধান উদ্‌বেগ ছিল লোকসানে থাকা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ঘুরে দাঁড় করানো এবং নিশ্চিত করা যে, তাঁর সনদটি ব্রিটিশ সরকার পুনর্নবীকরণ করবে।

বেন্টিংক ব্যয় কমানোর ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত পরিসরে নিযুক্ত ছিলেন, যাঁদের মজুরি কাটা হয়েছিল এমন অনেক সামরিক লোকের স্থায়ী শত্রুতা অর্জন করেছিলেন। যদিও ইতিহাসবিদরা তাঁর আরও দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেন, তাঁর আধুনিকীকরণ প্রকল্পগুলিতে জেরেমি বেন্থাম এবং জেমস মিলের উপযোগিতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত পশ্চিমাকরণের নীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ছিল আরও বিতর্কিত। তিনি আদালত ব্যবস্থারও সংস্কার করেন।

ইংরেজি শিক্ষা আইন ১৮৩৫ পাশ করার পর বেন্টিংক ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলেন। উচ্চ আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ফারসিকে প্রতিস্থাপন করে। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যখন তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কমিটি দেখতে পায় যে, '১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন, কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. জন গ্রান্ট এবং জে সি সি সাদারল্যান্ড, সি ই ট্রেভেলিয়ান, টমাস স্পেন্স, রামকমল সেন এবং এম জে ব্রামলি। সদস্যরা শিক্ষা, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ এবং ব্যাবহারিক শারীরবৃত্তির অভাব স্পষ্টভাবে মানদণ্ডের নীচে খুঁজে পেয়েছেন' এবং এটি বন্ধ করার সুপারিশ করেছিলেন, যা বেন্টিংক মেনে নেন এবং তিনি কলকাতা

মেডিকেল কলেজ খোলেন যা পশ্চিমি চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করে এবং এই কলেজের উদ্‌বোধনকে পশ্চিমি বিজ্ঞানের ভূমিকা হিসেবে দেখা হয়। ভারতে এটি ছিল এশিয়ার প্রথম পশ্চিমি মেডিকেল কলেজ এবং এটি জাতি বা ধর্মের পার্থক্য ছাড়াই সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। জেমস রোনাল্ড মার্টিন এই কলেজের সৃষ্টিকে বেন্টিংকের সতীদাহ প্রথাকে বাতিলের মতো অন্যান্য প্রশংসিত কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা দেখা যেতে পারে যে, রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দ্বিমুখী অবস্থানে ছিলেন, কিন্তু তিনিই প্রথমে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংককে দেশে সতীদাহ প্রথা বাতিল করার আইন পাশ করার জন্য প্রশংসা করেছিলেন।

বেন্টিংক কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। রামমোহান রায় হঠাৎ সতীদাহ প্রথার অবসানের বিরুদ্ধে বেন্টিংককে সতর্কও করেছিলেন। যাই হোক, পর্যবেক্ষণ করার পর যে আদালতের বিচারকরা সর্বসম্মতভাবে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে ছিলেন, বেন্টিংক তাঁর কাউন্সিলের সামনে খসড়াটি উপস্থাপনের জন্য এগিয়ে যান। গভর্নরের সবচেয়ে বিশিষ্ট কাউন্সেলর চার্লস মেটক্যাফ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, সতীদাহ নিষিদ্ধকরণকে 'বিদ্রোহ সৃষ্টির ইঞ্জিন' হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। যাই হোক, এই উদ্‌বেগগুলি তাঁকে তৎকালীন গভর্নরের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা থেকে বিরত করেনি 'ভয়ানক রীতির দমনে যার দ্বারা এতগুলি জীবন নিষ্ঠুরভাবে বলি দেওয়া হয়।'

এইভাবে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর রবিবার সকালে লর্ড বেন্টিংক সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি এবং ফৌজদারি আদালতে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে রেগুলেশন xvii জারি করেন। এটি অনুবাদের জন্য উইলিয়াম কেরির কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাঁর প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে : 'তাঁর উৎকণ্ঠিত পদবিক্ষেপ এবং তাঁর কালো কোটটি ছুড়ে ফেলে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আজ আমার জন্য কোন গির্জা নেই...আমি যদি এটি অনুবাদ করতে এবং প্রকাশ করতে এক ঘণ্টা দেরি করি, তবে অনেক বিধবার জীবন বিসর্জন হতে পারে।' এদিকে সন্ধ্যার মধ্যে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল।

১৮৩০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই আইন মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে প্রসারিত হয়। 'বিহার, বাংলা এবং উড়িষ্যা ইত্যাদির কয়েক হাজার হিন্দু বাসিন্দার স্বাক্ষরিত একটি পিটিশনের মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।' এবং বিষয়টি লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে যায়। ব্রিটিশ সমর্থকদের পাশাপাশি রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার অবসানের সমর্থনে পালটা পিটিশন পেশ করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিল পিটিশন প্রত্যাখ্যান করে এবং সতীদাহের নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের মতো উদারপন্থীরা ইংরেজি ভাষার পক্ষে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আইন সদস্য লর্ড মেকলে

বিতর্কটিকে একটি নির্দিষ্ট আকার দিয়েছেন। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ রাখা হয়েছিল তা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। মেকলের প্রস্তাবগুলি বেন্টিংক দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালের একটি প্রস্তাবে মূর্ত হয়েছিল, যা ঘোষণা করেছিল যে, 'তাঁর পরিষদে তাঁর প্রভুত্বের অভিমত যে ব্রিটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার।' রামমোহন রায় মূর্তিপূজা এবং গোঁড়া হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সকল প্রকার সামাজিক গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন একজন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ। এর ফলে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর পিতার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মতপার্থক্যের কারণে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নানা মামলায় তিনি দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হিমালয়ের চারপাশে ঘুরে তিব্বতে যান। তিনি নারী শিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন, যখন এটি সামাজিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল...বাংলা জার্নাল 'সম্বাদ কৌমুদী' তাঁর অগ্রণী ধারণা প্রচার করেছিল, কিন্তু অন্যদিকে গোঁড়া জার্নাল 'সমাচার-দর্পণ' তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছিল এবং তাঁকে কুখ্যাত করার চেষ্টা করেছিল—বিভিন্ন উপায়ে। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের বাজে প্রচারণার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর জার্নালে 'ব্রাহ্মণসেবধি'-তে অনেক যুক্তিযুক্ত তথ্য প্রচার করেছিলেন। হিন্দু সমাজের যে-কোনো ধরনের গোঁড়ামি বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি বহু বিতর্কমূলক বই এবং পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি 'ভট্টাচার্জীর সহিত বিচার', 'প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ' ইত্যাদি লিখেছেন। তিনি ইংরেজি জার্নাল 'ইনকুইয়ার' এবং ফারসি জার্নাল 'তুহফুত-উল মুহাহিদিন' শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখার উদ্যোগ নেন। তাঁর লেখা বাংলা ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে পরিচিত। তিনি বাংলা গদ্য-লেখার একটি নতুন পথ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। গোঁড়া বাঙালি সমাজ তাঁকে এইভাবে সমালোচনা করেছিল—'সুরাই মেলের কুল, ও তার বাড়ি খানাকুল, ওম তৎ সৎ বোলে বেটা খুলেছে ইস্কুল।' তিনি তাঁর জীবনের আঠারো বছরেরও বেশি সময় ধরে গোঁড়ামি এবং অন্যান্য পশ্চাদপর ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৮৩১ সালে রামমোহন রায় মুঘল সম্রাটের ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেন, (দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ) মুঘল সম্রাটের পেনশন ও ভাতা আদায়ের জন্য। রাজা রামমোহন রায় মেনিনজাইটিসের কারণে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলের কাছে স্ট্যাপলটনে মারা যান। তাঁর শেষ জীবনের কিছু সপ্তাহের ঘটনাবলি মেরি কার্পেন্টারের 'লাস্ট ডেজ অফ রাজা রামমোহন ইন ইংল্যান্ড' বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

বিদ্যাসাগর ও শিক্ষক সমাজ

শিক্ষক হলেন সমাজের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা হল সমস্ত পেশার জন্মদাতা। এই প্রবন্ধে একজন শিক্ষকের ভূমিকা ও কার্যাবলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আলোচনা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে-কোনো দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি নতুন অধ্যায়ের রূপকার ছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই সময় একটি নতুন চিন্তাভাবনা তরঙ্গ, যৌক্তিক চিন্তাভাবনা, অপশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বাংলার জীবনকে প্রচণ্ড অভিঘাত দিয়েছিল এবং ঐতিহ্যগত ধারণার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেই রূপান্তর পর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার প্রত্যন্ত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার জন্য সেই সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে যদি আমরা সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অনেক মহান ব্যক্তিত্ব বাংলার সমাজ সংস্কার, ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রকে আলোকিত করেছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, সহৃদয় এবং উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগর তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে নিকটবর্তী বিংশ শতাব্দী এবং দূরাগত একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। বর্তমানকালে তাঁর শিক্ষাগত ধারণা এবং অবদানগুলিকে নতুন কোণ থেকেও অনুধ্যান করতে হবে এবং এটিই হবে তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাঞ্জলি। উনিশ শতকে কিছু বাঙালি পণ্ডিত তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছিলেন, তবে তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। কবি মাইকেল মধুসূদন ঠিকই বলেছেন—'He is the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and heart of a Bengali mother.'

বিদ্যাসাগর তাঁর সারাজীবন শিক্ষার সংস্কারের জন্যও সংগ্রাম করেছেন এবং নিরলসভাবে আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। বাংলার পাশাপাশি ভারতীয়

শিক্ষারও। তাঁর সংস্কারের মৌলিক বিষয়, যেমনটি বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন 'সহজতর করার জন্য 'সংস্কৃত শব্দ এবং ইংরেজি শেখার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার একত্রিত করা এবং তার প্রশিক্ষণ দেওয়া।'

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে আঞ্চলিক উপভাষাগুলিকে একত্রিত করা এই কাজটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবত শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এটাই সবচেয়ে বড়ো অবদান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি ও মহান মানব। তিনি শুধু তাঁর অবদানের জন্যই পরিচিত নন শিক্ষাগত ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং ভাষার উন্নয়নে অবদানের জন্যও নমস্য।

আধুনিক বাংলা ভাষার তিনিই পথপ্রদর্শক, যিনি তখনকার পাঠকদের সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন।

জটিল বাংলা ভাষা, যার উৎপত্তি ছিল সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা। বর্তমান গবেষক মনে করেন, বিদ্যাসাগরের অবদান এক স্বাবলম্বী বাংলা ভাষা নির্মাণে ও নতুন সমাজ গঠনে অবদান এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন আলোকবর্তিকা যে এই সময় থেকেই বিচার করতে হবে।

বিশ শতকের জন্য নয় বরং বিশ শতকের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়ার জন্য তার অতীত যুগে তৈরি করা সময়ের অবদানও বিবেচ্য।

বিশ শতকের প্রথম সংস্কারের তার শিক্ষাগত ধারণাকে অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয়তার জন্য পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁর শিক্ষাগত ধারণাগুলি এত মূল্যবান ছিল যে, স্বাধীন ভারতের অনেক শিক্ষা কমিশন সকলের জন্য শিক্ষার ধারণা নিতে পারে, শিশুশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষক হলেন শিক্ষার মশালবাহক।

তাই শিক্ষকদের ভূমিকা ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের এক রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ছিল একজন শিক্ষক সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ধারণা, এটি অবশ্যই আজকের সমালোচনা। তাঁর জীবন ও কর্ম ছিল সমাজের একজন আদর্শ শিক্ষকের ইঙ্গিত? এই ধরনের প্রশ্ন বর্তমানের জন্য এবং সেইসঙ্গে সমাধান খুঁজে বের করার অবস্থান তৈরি করতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। তাই কয়েকটি আশু প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠতে পারে—

বিদ্যাসাগরের মতে একজন আদর্শ শিক্ষকের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?

বিদ্যাসাগরের মতে একজন শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত?

সে সময়ের একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?

বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতটা প্রাসঙ্গিক?

শিক্ষা এমন এক আলো যা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু

একজন শিক্ষার্থীকে সাক্ষর করে তোলা নয়, উদ্দেশ্য হল যুক্তিযুক্ত চিন্তা, জ্ঞানের ক্ষমতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকাশ। পরিবর্তনের ইচ্ছা, যে-কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগতির আশা আছে। সৃজনশীলতা বিকশিত হতে পারে এবং উদ্ভাবনের সুফল পাওয়া পাবে ছাত্র এবং শিক্ষকের উভয়েরই। ঐতিহ্যগত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বক্তৃতা এবং ছাত্রদের একটি বার্তা দেন গ্রহণকারী হিসেবে শিক্ষার্থী একটি বার্তা গ্রহণ করে কিন্তু এখন সময় পালটেছে। শিক্ষক কেবল বিষয়বস্তুর উপস্থাপক নন তাঁদের এমন একজন সহায়ক হওয়া উচিত যেখানে তাঁরা স্ব-শিক্ষার সুযোগ প্রদান করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের স্ব-শিক্ষার জন্য সক্ষম করতে পারেন।

বিদ্যাসাগরের মতে আদর্শ শিক্ষক হবেন একজন পরিশ্রমী ও দক্ষ, পাশাপাশি একজন সতর্ক লেনদেনকারী। একজন ভালো শিক্ষক সর্বদা সমস্ত কিছুকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন কারণ তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সর্বদা গ্রহণযোগ্যতার মেজাজে থাকেন লেনদেন বিষয়ে। বাংলা সরকারের তৎকালীন শিক্ষাসচিব ড. মোয়াট বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যেখানে একজন ভালো শিক্ষকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—'এই শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রকৃতি নিম্নলিখিত ধরনের হতে হবে, তাঁদের নিজেদের ভাষায় নিখুঁত দক্ষ হতে হবে, অধিকারী হতে হবে কুসংস্কার মুক্ত ধ্যানধারণার—যথেষ্ট পরিমাণে দরকারি তথ্য এবং তাদের দেশের কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকুন। যেমন একটি উপায় হল—পুরুষদের উপযোগী শ্রেণি হল সেই বস্তুটি যা আমি নিজের কাছে এবং সিদ্ধির জন্য প্রস্তাব করেছি, যার সমস্ত শক্তি আমাদের সংস্কৃত কলেজকে উচ্চ আরোহণ করবার জন্য নির্দেশিত করা উচিত'।

তাঁর কাছে একজন শিক্ষকের ক্ষমাশীল হওয়া উচিত এবং একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশনা হিসেবে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাঁকে অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে এবং জীবনেও কঠোর নীতির পুরুষ/নারী হতে হবে। তাঁদের অবশ্যই সময়ে আসতে হবে এবং সময়মতো চলে যেতে হবে স্কুল বা কলেজ থেকে। তাঁকে অবশ্যই বন্ধু হতে হবে এবং শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। একজন ভালো শিক্ষক তৈরি করুন যিনি বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার সুস্পষ্ট পরিবেশ, কিন্তু শারীরিক ভয় ছড়ানোর পরিবেশ তৈরি করবেন না, অন্য ধরনের শাস্তি দেবেন না। বিদ্যাসাগর সর্বদা শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের ভালো মানবিক সম্পর্কের কথা ভাবতেন। ভাবতেন না শাস্তিদাতার পরিবেশ। কিন্তু বিদ্যাসাগর কখনও ছাত্রদের দুষ্টুমি ও অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি ভবিষ্যতে তাদের প্রকৃত বিকাশের জন্য ছাত্রদের দুষ্টুমি বা অসদাচরণগুলির সঠিক সংশোধনের বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করেন, জীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার দুটি অপরিহার্য উপাদান শিক্ষক ও শিক্ষার সর্বাত্মক উন্নয়ন তখনই হবে যখন উভয়ের বন্ধনে গড়ে উঠবে সুন্দর সম্পর্ক সঙ্গে সংযুক্ত হবে এই ধরনের সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে যদি তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা সংযুক্ত

না হয়, এই শিক্ষাই হল শিক্ষকের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং শিশুর প্রতি প্রকৃত স্নেহ।

একজন শিক্ষক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:

একজন শিক্ষক কখনোই বিবেক ও চেতনাকে দূরে সরিয়ে দেন না কোনো লোভনীয়তার পরিবর্তে।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' জীবনীগ্রন্থের লেখক উদ্ধৃত করেছেন—'অনেক বেসামরিক লোক ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে এর বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য গ্রেট ব্রিটেন থেকে আসা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরেছে...যারা ছিল। পরীক্ষায় ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছে, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাবর্তন-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, স্পষ্টতই এর জন্য খুব বিরক্ত হয়েছিল কারণ, তাই একবার তাঁর উচ্চতর কর্তৃপক্ষ মি. মার্শাল প্রধান পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষার সিস্টেম শিথিল করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

তারপর যুবক বিদ্যাসাগর তার প্রবীণ বস মিস্টার মার্শালকে স্পষ্টভাবে বললেন—'তা হবে না। আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়। আমি আমার চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে পারি, কিন্তু এই ধরনের প্রস্তাবের সঙ্গে আপস করতে পারি না।' এই উদাহরণটি ইঙ্গিত দেয় যে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই মনের মধ্যে যে-কোনো একদেশদর্শিতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, তিনি কখনোই এর সঙ্গে আপস করবেন না। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যে-কোনো ধরনের অন্যায় করা চলবে না। বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে দেখানো হয়েছে, উপদেশের চেয়ে উদাহরণ উত্তম। তাঁর কাছে একজন শিক্ষক পরিশ্রমী, অধ্যয়নশীল এবং জ্ঞান-অন্বেষণকারীও হওয়া উচিত। তিনি নিজেই এর সেরা উদাহরণ ছিলেন।'

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষক হিসেবে তাঁর নতুন চাকরি শুরু করে, তিনি ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা শিখতে শুরু করেন। একইসঙ্গে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মরত ছিলেন এবং যথাসময়ে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতেন এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কবিতা পাঠ। এরপর তিনি নিজে ইংরেজি ও হিন্দি পড়তেন ও লিখতেন। তিনি অর্জন করেছেন নিজস্ব জ্ঞান।

তাঁর দৃঢ় শ্রম, অধ্যয়ন এবং কৌতূহলী মন দ্বারা কিছুদিনে ইংরেজি এবং হিন্দিতে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন।

শিক্ষক বিদ্যাসাগর সর্বদা সময় সময় বিষয়বস্তু এবং পাঠদান পদ্ধতি পুনর্নবীকরণ করতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের কাছে একজন শিক্ষক ছাত্রের সহায় হওয়া উচিত। পাঠদান প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা দেখা দিলে একজন ভালো শিক্ষক সর্বদা এটি বোঝার চেষ্টা করেন এবং একইসঙ্গে এটি শেখানোর নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তিনি আরও মনে করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষা সর্বদা সঠিক মানুষ তৈরি করে। শিক্ষকরা হলেন প্রকৌশলী সমাজ। তাঁরা সর্বদা মানবমনন সৃষ্টিকে তাঁদের একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করবেন। শিক্ষকও বন্ধু এবং অনুপ্রেরণার আলো শিক্ষার্থীদের জন্য। শিক্ষককে অবশ্যই ইতিবাচক চিন্তাশীল হতে হবে। শিক্ষক সবসময় পথপ্রদর্শক হিসেবে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন তাঁদের সন্তানদের উন্নতির জন্য। ভালো শিক্ষকের নীতিযুক্ত মানুষ হওয়া উচিত। তিনি কখনোই সত্যের সঙ্গে আপস করেন না তাঁর কাজের খাতিরে। একজন শিক্ষকের কাছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ হওয়া।

আজকাল শিক্ষক হল ছাত্রের সহযাত্রী এবং ছাত্রদের যাত্রার সহযাত্রী। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর' বই থেকে দেখা যায়—'কলকাতার বিশিষ্ট বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে একবার দেখা গিয়েছিল তিনি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সংস্কৃত শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন বিদ্যাসাগর রাজি হন, কিন্তু বাবু রাজকৃষ্ণের বার্ধক্য বিবেচনা করে তিনি এতগুলো বছরের শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তে সহজতম উপায়ে শিক্ষাদানের নতুন ধারণা উদ্ভাবনের সিদ্ধান্ত নেন।'

অবশ্যই তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথম দিনেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, তোমাকে সহজে শেখানোর জন্য নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং পরের দিন তিনি এসে দেখলেন যে, বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই বাংলা লিপিতে একটি নতুন ব্যাকরণ লিখেছেন 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' তার নাম।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

আধুনিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র ছাত্রকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে, এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনবাদী হওয়া উচিত। শিক্ষকের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে জ্ঞান গঠন। শিক্ষক সর্বদা একজন শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করেন যা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

যখন একজন শিক্ষকের প্রতিফলনমূলক শিক্ষা-অনুশীলন হওয়া উচিত, তখন শিক্ষার্থী সফলভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। তিনি কেবল অনুপ্রাণিত করতে পারেন। বহির্জগৎকে প্রকাশ করার জন্য অভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে জাগিয়ে তুলুন। শিক্ষাদানে দক্ষতা অর্জনের জন্য আজ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ করা হয়, ইউনেস্কো

মতানুসারে যে, আমি শিখতে শেখার জন্য প্রয়াস করেছি। শিক্ষককে সহানুভূতিশীল মানবিক একজন হিসেবে প্রস্তুত করা উচিত। এখন শৃঙ্খলারক্ষায় যে-কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ। বর্তমানে শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা হিসেবে বিবেচিত। তাই কিছু পেশাগত নৈতিকতা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষককে আরও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

শিক্ষককে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।

তাকে অবশ্যই দরিদ্র ছাত্রদের মূলধারায় আনার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শিক্ষককে অবশ্যই বইয়ের সঙ্গে একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্য মূল্যভিত্তিক (নীতিবোধ সম্মত) মানুষ তৈরির ধারণাগুলি লেনদেন করতে হবে।

জ্ঞান

শিক্ষককে অবশ্যই সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া এবং সঠিক সময়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে।

শিক্ষক কখনোই ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণ বা লিঙ্গ ইত্যাদি অনুসারে ছাত্রদের বৈষম্য করেন না।

শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতাকে ন্যায্যতার জন্য শিক্ষা দিতে হবে।

বইয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য একজন শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরে নির্দেশ দিতে হবে।

শিক্ষককে কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে এবং তিনি অন্যদেরকে সেই জিনিসগুলি থেকে বিরত হতে সাহায্য করবেন।

তাঁকে স্বাধীন মনের অধিকারী হতে হবে এবং কখনোই কোনো ধরনের উপদ্রব না করা উচিত।

শিক্ষক সর্বদা ছাত্রের আত্মসম্মান এবং ব্যক্তিত্বের উন্নতির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করবেন।

এ ছাড়াও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ভবিষ্যতের জন্য সুস্থ হতে হবে। শিক্ষকের উচিত ছাত্রের অনুপ্রেরক ও বন্ধুর ভূমিকা নেওয়া। তিনি সবসময় ছাত্রের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা তৈরি করবেন।

শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্ক

শিক্ষক সবসময় ছাত্র ও অভিভাবকের মধ্যে সেতুবন্ধন করবেন। শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র, অভিভাবক ও সমাজ অপরিহার্য আদানপ্রদানকারী। একজন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বাড়িতে সর্বাধিক সময় ব্যয় করে, তাই তার বিকাশে বাড়ির একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

তাই, প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে শিক্ষক সবসময় ছাত্রের অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। তাঁকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর উন্নতির জন্য এবং অন্যান্য কারণেও অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

শিক্ষক-সমাজ সম্পর্ক

শিক্ষক যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের প্রকৌশলী, তাই তাঁকে ভালোভাবে কাজ করতে হবে এবং সমাজের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক রাখতে হবে। শিক্ষককে অবশ্যই ছাত্রের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে অংশ নিতে হবে। একজন ভালো শিক্ষক হতে গেলে একজন সত্যিকারে সমাজকর্মী হতে হবে। একটি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যায়, হুগলি জেলার এক প্রাথমিক শিক্ষক শুরু করেন শিক্ষার্থীদের জন্য রাস্তার ধারে শিক্ষাদান এবং তিনি নিরক্ষরদের জন্য শিগগিরই সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু করার চেষ্টা করেন!

এই করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে অভিভাবক ও শিক্ষককে তাঁর কাজের জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। শিক্ষককে অবশ্যই সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হবে।

সমাজেরই সত্যিকার পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা নিন শিক্ষক। প্রাচীন গ্রিসে, আমরা মহান শিক্ষকদের জীবনকাহিনি শুনেছি। যেমন—সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল ইত্যাদি।

একজন ভালো শিক্ষক সমাজের কাছে প্রকৃত জ্ঞানের মশাল বহনকারী।

একজন শিক্ষক-প্রশাসক হিসেবে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন বই অনুসারে (জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র ইত্যাদি) এটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পাওয়া যায়,

বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পাশাপাশি ভারতের একজন মহান সংস্কারক ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি শিক্ষাব্যবস্থারও সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি দেশে দীর্ঘ অবহেলিত নারীশিক্ষা শুরু করার পথপ্রদর্শক ছিলেন।

তিনি তাঁর জীবনের সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছেন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে।

তিনি ছিলেন একজন জন্মগত শিক্ষক এবং তৎকালীন বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে একজন ভালো প্রশাসক।

তিনি সর্বদাই শিক্ষাগত সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার উন্নতির কথা চিন্তা করতেন।

বহু সামাজিক সংস্কার, যেমন বিধবা-পুনর্বিবাহ, বহুবিবাহ নির্মূল তাঁর লেখার মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রচেষ্টাও তিনি করেন।

কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি সমস্ত বর্ণ, ধর্ম বা সামাজিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন।

অসহায় ছাত্ররা সুযোগ পেল পড়াশোনার। এটা বিদ্যাসাগরের অনেক বড়ো অবদান।

বিদ্যাসাগর বাংলার একজন সফল প্রাইমার (বর্ণপরিচয়) লেখক ছিলেন। তিনি স্কুলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক বই লিখেছেন।

স্কুল-বুক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর সদস্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একজন হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

তিনি তৎকালীন বাংলার কোনো কোনো জেলায় কয়েকটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ্যক্রমের প্রণেতা হিসেবে শিক্ষক

বিদ্যাসাগরের মতে, শিক্ষক নিছক লেনদেনকারী নন। তিনি হলেন পাঠ্যক্রমের নির্মাতা। একজন শিক্ষক মূলত ছাত্রদের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং অভিভাবক। আজকাল তাদের শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলা হয়, তাই তিনি প্রয়োজনভিত্তিক করতে পারেন মসৃণ লেনদেনের জন্য শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম। শেখা এখন অনেক জটিল, তাই একজন শিক্ষক গঠন করতে পারেন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সহজ শিখন পন্থা।

কার্যকলাপের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম কার্যকরভাবে তৈরি করে আনন্দদায়ক উপায়ে। তাঁর অভিজ্ঞতা পাঠ্যক্রম গঠন করে শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের জন্য আরও

নিখুঁত হওয়া দরকার। একটি নমনীয় পাঠ্যক্রম শিশুদেরকে তাদের নিজেদের তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে শিক্ষক

শিক্ষককে নিজেই একজন শিক্ষাবিদ হতে হবে। একজন শিক্ষকের মধ্যে একজন শিক্ষাবিদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেকে নির্দেশনা করেন। বিদ্যাসাগর যেহেতু একজন সফল শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন, তিনি হয়েছিলেন উনিশ শতকের বাংলা তথা দেশের শিক্ষার পথপ্রদর্শক নক্ষত্র। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক শিক্ষাবিদও বটে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বাংলা সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে মাসিক পরীক্ষার প্রবর্তনও তাঁর বিশেষ অবদান। উল্লেখ্য বর্তমানে কন্টিনিউয়াস কমপ্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন (সিসিই) নিয়ে তাঁর অনেক কথা হচ্ছে। এই নতুন সমষ্টিগত এবং গঠনমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের সারা বছর মূল্যায়ন করা হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সুচিন্তিত শিক্ষাবিদ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এই বিষয়ে যে, সেই সময়ে যখন কার্যত কিছুই ছিল না তিনি সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন।

ক্রম শিখনের জন্য একজন ব্যক্তির সম্ভাব্যতার সমস্ত দিক বিকাশের ওপর চিহ্নিত করা। তাই বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে তিনি সময়ে সময়ে মূল্যায়নের পক্ষপাতী ছিলেন।

বর্তমান কাল

মাসিক পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সারা বছর সক্রিয় করতে এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে এইভাবে।

নিয়মিত বিরতি। জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (২০০5) অনুসারে একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষককে অবশ্যই একটি তৈরি করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক শেখার অভিজ্ঞতার পরিবেশ।

NCFTE (জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম)-2009 নির্দেশিত যে-কোনো সিস্টেমকে সামনের দিকে তাকানোর জন্য অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে।

পরীক্ষা এবং উদ্ভাবনগুলিও এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলাফলের ক্রমাগত পর্যালোচনার সঙ্গে জড়িত।

পরীক্ষাগুলি অবশ্য, উত্তেজনাপূর্ণ মডেলগুলির প্রতিস্থাপনের অর্থ নয় তবে চেষ্টা করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা উচিত।

কার্যকর বিকল্প মডেলের দিকে নতুন কাঠামো যা যে-কোনো শিক্ষাব্যবস্থা তৈরিতে সতেজতার সংস্কৃতি নিয়ে আসে।

শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত হবেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বিদ্যাসাগর সর্বদাই যে-কোনো বয়সি পরিবর্তনের জন্য তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন।

একটি উদ্ভাবনী এবং প্রাণবন্ত বিকল্প দ্বারা প্রচলিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন।

উপসংহার

ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এনসিএফ) ২০০৫, শিক্ষার অধিকার আইন, ভারতীয় নির্দেশিকা

সুপ্রিম কোর্ট (ভারতবর্ষ)—জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা। বিদ্যাসাগর, তিনিও একই কাজ করেছিলেন যখন তিনি ধীরে ধীরে বিভিন্ন শ্রেণির অ-ব্রাহ্মণদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সব শ্রেণির ছাত্রের আজকাল বায়োমেট্রিক উপস্থিতির ধারণা রয়েছে। অনেক রাজ্য সরকার স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিতির নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দিয়েছে। স্বীকার করতে হবে তারা এখন যা করছেন, বিদ্যাসাগর একই কাজ করেছিলেন। যখন তিনি সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতা আনতে উদ্যত হয়েছিলেন।

এই উত্তর-আধুনিক বিশ্বে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বিষয় হল সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার।

দৃঢ় বিদ্যাসাগর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভরতি ফি ও টিউশন ফি নেওয়া শুরু করেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি নেওয়া উচিত (যারা দিতে পারবে)।

NCF (জাতীয় পাঠক্রম পরিকাঠামো)-2005 মুখস্থ শিক্ষার পরিবর্তে অর্থপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক শিক্ষার ওপর জোর দেয়।

দীর্ঘ অতীত যখন তিনি সরলীকরণ করেছেন, বাদ দিয়ে সিলেবাসকে যৌক্তিক করেছেন অপ্রাসঙ্গিক, জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অন্যান্য পাঠ্য। বিদ্যাসাগর

মাসিক পরীক্ষার প্রচলনেও সচেষ্ট ছিলেন।

বিশেষ উল্লেখ্য—এখনকার দিনে কন্টিনিউয়াস কমপ্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন (সিসিই) নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে। মূলত সমষ্টিগত এবং গঠনমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে এই নতুন প্রক্রিয়াটিতে সারাবছরই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য পথিকৃৎ ছিলেন যে, সেই সময়ে তিনি অনেক কিছুই ভেবেছেন যা এই সময়ের জন্য উপযুক্ত।

সামগ্রিক শিক্ষা—একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিক বিকাশের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। তাই বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে—পরীক্ষায় তিনি সারাবছর শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করতে মাসিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। তাঁর অসামান্য প্রচেষ্টা তাঁর জীবনকাল জুড়ে শিক্ষাদানের ঐতিহ্যগত পদ্ধতির একটি সামগ্রিক পরিবর্তন করেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থার দৃশ্যপট কার্যকরভাবে পরিবর্তন করতে হবে। তিনি (বিদ্যাসাগর) ভূমিকা অন্বেষণ এবং প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং শিক্ষকদের কার্যাবলি গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দৃশ্যপট কার্যকরী পরিবর্তন করতে সক্ষম হন।

বাঙালির উনিশ শতক আত্মজিজ্ঞাসার আত্মনির্মাণের আর...

বাঙালির উনিশ শতক অনেক চাওয়া-পাওয়া আবার না পাওয়ার যুগ, গোটা শতকের আলোচনা বিক্ষিপ্ত মনে, স্বল্পপরিসরে, নিরন্তর তাগাদায় সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়, যদিও এই সময়ই ছিল বাঙালির sigh at Albion's shore, আবার তেমনি নতুন পরিচয় করার এফিটাফ লেখারও সময়। এই সময়েই বাঙালি নিজেকে হারিয়েই আবার খুঁজেছে। আবার এই সময় নিয়েই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—'If Periclean Athens was the school of Hellas, the eye of Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the rest of India under British rule, but with a borrowed light, which it has made its own with marvelous cunning. In this new Bengal originated everygood and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India. From Bengal went forth the English educated teachers and the Europe inspired thought that helped to modernise Bihar and Orissa, Hindustan and Deccan. New literary types, reform of the language, social reconstruction, political aspirations, religious movements and even changes in manners that originated in Bengal, passed like ripples from a central eddy, across provincial barriers to the furethest corners of India.' (History of Bengal, Dacca University, Vol-II, editeed by Jadunath Sarkar, page 498). বাংলায় এই সময় রেনেসাঁসের কথা বলা হয়েছে। যা মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একরূপ। এই রেনেসাঁস সর্বাত্মক কিনা এই নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও বলা যায় যে, এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম সবকিছুতেই প্রবল অভিঘাত এসেছিল। সাহিত্যে মধুসূদন-বঙ্কিম, পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ এর ফসল উত্তুঙ্গ মাত্রায় ফলিয়েছিলেন। ধর্মজীবনে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ জোয়ার এনেছিলেন। মানবমন্ত্রের সাধনায় অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসেছেন। সংবাদপত্রের ইতিহাসের সূচনাও এই পর্বে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

সতীশচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখেরা নতুন যাত্রাপথের সূচনা করেছেন। ব্রিটিশের শিক্ষা-শাসন-শোষণ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসার বীজ বপন করেছে, আবার নতুন করে বাঙালির জীবনে ফুটে উঠেছে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার প্রয়াস। মুসলমান লেখক-কবিদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, পরবর্তীতে বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখেরা বাঙালি জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার এনেছেন।

কলহপরায়ণ, আত্মসুখী বাঙালি নিজের ক্ষুদ্র কোটর ছেড়ে বৃহত্তর জীবনের জোয়ারে গা ভসিয়েছেন। বাঙালির মানসিকতায় অগ্নিসংযোগ করেছে উনিশ শতক। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার বিষয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ এসেছে এই সময়েই। আবার এই সময়েই বাঙালি জীবনে রাজনৈতিক সামাজিক পটপরিবর্তনের সূচনার সময়কাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, শরৎচন্দ্র বসু, পরবর্তীতে সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।

উনিশ শতকের বাঙালি নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গেছে। তারা জীর্ণদীর্ণ প্রাণে নব চেতনার জোয়ার প্রত্যক্ষ করেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্রের মতো ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে বাঙালির ভাগ্যাকাশে। ব্রিটিশরা শাসনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। রেলপথ, সড়কপথে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালির খুব উন্নতি না হলেও একশ্রেণির বাঙালি বেনিয়া, মুৎসুদ্দি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে।

ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের ভাষায়—'The self-respect at issue here was the self-respect of a subject people reconciled to its subjection. Its loss was not ascribed to want of political independence, but to want of recognition within the frame work of colonial dependence'। এখানে প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের সম্পর্ক ভৃত্যের আত্মমর্যাদার চেতনা। নিজের দেশে নিজে প্রভুত্ব করব—এ ইচ্ছা তখনও জাগেনি। আসলে প্রয়োজন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মপরিচয় খুঁজে বের করার প্রয়াস। Benedict Andereson-এর মতে '...the members of even the smallest nation will never known most of their fellow member, meet them or even hear of them.'

'বাঙালীর মনে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি জিনিস একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল—যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা; আবার কতকগুলি জিনিস নূতন চক্ষে, নূতন ভাবে দেখিতে শিখিলাম—যেমন ঈশ্বর, নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক।' 'বাঙালী জীবনে রমণী' বইয়ে ওপরের উক্তি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর।

তাঁর মতে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্য থেকেই উনিশ শতকের বাঙালি রোমান্টিক ধারণায় ঋদ্ধ হয়েছে। কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের এই উন্মেষ আছে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথেও। তবে এ কথা তিনি অস্বীকৃত নন যে, ভারতীয় ধ্রুপদি সাহিত্যে এমন কোনো প্রণয় নেই যা শরীরাশ্রিত হয়েও সম্পূর্ণত শারীরিক নয়, আত্মিক। তবে অনেকেই মেনেছেন যে, উনিশ শতকে বাঙালির যে নতুন সাহিত্যসূচনা তার প্রভাবেই বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষিত বাঙালির প্রেমের ধারণা। তবে পরবর্তীতে নীরদচন্দ্রের ধারণা বহুলাংশেই পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে উনিশ শতকেই বাঙালির মনে ইংরেজ ঘর্ষণে দেশপ্রেমের উদয় হয়েছিল। তাই তো লেখা হয়েছিল, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে'/ ইত্যাদি। যা হোক এই স্বাধীনতা যে-কোনো জাতির জীবনে পরম ধন। প্রকাশ্যে বা গোপনে দীর্ঘ সময় ধরে তা লালনপালন করেছে বাঙালি।

উনিশ শতকেই বাঙালির জীবনে একেশ্বরবাদের ধারণায় ব্রাহ্মধর্মের সূচনা করেছেন রামমোহন। পরবর্তীতে যে ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তিত্বরা। কেশব সেন ব্রাহ্মধর্মে হিন্দু আচার এনেছিলেন।

এর সঙ্গে জোরদার সংঘর্ষ চলেছে খ্রিস্টধর্মের। মাঝখানে পড়ে আছে হিন্দুধর্ম, মুসলিমধর্ম ও অন্যান্যরা। উনিশ শতকে বাঙালি ইউরোপীয় প্রভাবেই একাধিক সভা বা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছে। যেখান থেকে পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেস ও আরও পরে মুসলিম লিগ। তার ওপরে কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট ইত্যাদি রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের সূত্রপাত।

উনিশ শতকে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয়, মিশনারি শিক্ষার পাশাপাশি কোম্পানির প্রয়াস দেখা যায়। যেখানে ঘোষিত ছিল লর্ড ব্যারিংটন মেকলের নীতি— '...to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion. in morals and in intelect. (Lord Macaulay in a Minute on Indian Education, 1835) পরে লক্ষাধিক টাকা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ব্যয়িত হওয়ার নীতি ঘোষিত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় একদল শিক্ষাজীবী তৈরি হওয়া শুরু হয়। এর পরের ইতিহাস উনিশ শতকের হান্টার কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত আছে। শুরু হল 'চুইয়ে পড়া' শিক্ষানীতি, যা ভারতীয় শিক্ষাকে ভিতর থেকে অন্তঃসারশূন্য করে চলে গেল। তার উল্লেখ বিশ শতকের সার্জেন্ট কমিটি (১৯৪৪ খ্রি.) বা পূর্ববর্তী হার্টগ কমিটির (১৯২৯ খ্রি.) রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে চিহ্নিত হয়েছে। পূর্ববর্তীতে ছিল রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামের শিক্ষাসমীক্ষা যা অ্যাডাম রিপোর্ট (১৮৩৩, ১৮৩৫ ও ১৮৩৭ খ্রি.) নামে খ্যাত। এ ছাড়া উডের ডেসপ্যাচও ওই পর্বের আলোচিত শিক্ষাদলিল।

উনিশ শতকের আর-এক নাম বাঙালি রেনেসাঁসের উদয়, যাকে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের চতুর্দশ শতকের অক্ষম অনুকরণ বা অনুরণন বলা যায়। যা হোক এই রেনেসাঁসের ফলে বাঙালির শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে কিছুটা হলেও আলোড়ন উঠেছিল। ফল বাংলা কবিতা নাটক গদ্য ইত্যাদির বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পেলাম মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড়ো প্রতিভায় ও আরও অসংখ্য নীহারিকা পথের মতো অন্যান্য প্রতিভার মুখর স্ফুরণে। এসেছিল কথিকা উপন্যাসের মতো নতুন সাহিত্যরূপ। উনিশ শতকে চিত্র, শিল্প ও ভাস্কর্যেও নতুনত্ব দেখা দিতে শুরু করেছিল, যার বিবিধ চেহারা আমরা পাই বেঙ্গল স্কুলের চর্চায়। উনিশ শতকেই বারোয়ারি উৎসবেরও সূচনা হয়েছিল। সবদিক থেকে এই উনিশ শতকে বাঙালির জীবনে অভিঘাত এল 'বিপুল তরঙ্গে—', এইজন্যই উনিশ শতকের অভিঘাত বিশ পেরিয়ে একুশে আরও কিম্ভূত, অদ্ভুত, নতুনতর নানা চেহারা চরিত্রে ফুটে বেরিয়েছে।

উনিশ শতকেই বাঙালি সংবাদপত্রের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথমে বিদেশি ইংরেজরা তথা শ্রীরামপুর মিশন, পরে বাঙালির নিজস্ব উদ্যোগেও বহু পত্রিকার উদয় হয়েছে। বাঙালি পত্রিকা সম্পাদকের মজদুরি করেছে। কতশত পত্রিকার উদয়াস্ত ঘটেছে। সমাচার দর্পণ, মিরাতুল আকবর থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট, সাধারণী, সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পর্যন্ত, যার সব নাম করলে বিরাট নামাবলি হওয়াও বিচিত্র নয়। সংবাদপত্র বাঙালি জীবনের সালতামামির ইতিহাস থেকে সাময়িক নানা বিষয়ের বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়েছে। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ১৮৭২ সালে লিখেছিল 'কটকিদার তালুকদার জমিদার ও রাজা সকলেই সমান। প্রজা মরুক বাঁচুক শোষণ করাই তাঁহাদিগের কার্য।' আবার 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৩ সালে লিখেছিল—'অসুর দেশীয় নীলকরের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করিলে পাষাণ সদৃশ মনুষ্যেরও অশ্রুপাত হয়। তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব-স্ব লোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন।'

উনিশ শতকে বাংলায় ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ দিয়ে শুরু হয়ে কৃষক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি নানারূপে বিধৃত হয়েছিল। সেকালে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গ থেকেই পত্রপত্রিকা প্রকাশের ধুম পড়েছিল।

উনিশ শতকের শিক্ষায় নারীশিক্ষার মুকুলটিও অঙ্কুরিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি দুতরফেই প্রয়াস-বিরোধ যুগপৎ ক্রিয়াশীল ছিল, তা সত্ত্বেও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বীজ উপ্ত হয়েছিল। এমনকি নানা বাধা অতিক্রম করে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গাঙ্গুলি প্রথম মহিলা চিকিৎসক হওয়ার পথেও পা বাড়িয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের স্বাধীনতা হিন্দু বা অন্যান্য দেশীয় মেয়েদের চেয়ে বেশিই ছিল।

তাই লেডি অবলা বসুকে (বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) পাওয়া যায়।

উনিশ শতকেই বাংলায় বারোয়ারি দুর্গাপুজো, দেশি ও অন্যান্য পালাপার্বণের কাহিনিও কিছু কম নেই। উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে ছাপাখানার জন্যও চিহ্নিত হতে পারে। প্রথমে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, পরবর্তীতে ইংরেজ রাজধানী কলকাতার বউবাজার, কাসাইটোলা, জোড়াবাগান, পাথুরিয়াঘাটা, কুমারটুলি, চৌরঙ্গি, বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, বড় বাজার ইত্যাদি অঞ্চলে বই, পত্রপত্রিকার জন্য ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। বাংলা টাইপ অক্ষর সেটিংয়ে পঞ্চানন কর্মকারের কথা প্রায় সকলেরই জানা। এর উদ্যোক্তা মূলত শ্রীরামপুরের মিশনারি জোশুয়া মার্সম্যান। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলার বটতলা থেকেও একধরনের বই প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাসের খাতিরে যাদের মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। অনেকক্ষেত্রে এদের সাহিত্য-শিল্পমূল্যও যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে বিচার্য।

বাংলা বা বঙ্গে বই রচনা ও প্রকাশে উনিশ শতকে যে জোয়ার এসেছিল সেখানে বহু নামি অনামি ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছে।

আবার এই উনিশ শতকই বিদ্যালয় ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক রচনার যুগও। এই যুগেই আবার বিদেশি সাহিত্যের বঙ্গীকরণের নানা প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। এই উনিশ শতকেই জেলে পাড়ার সং, বাইনাচ-গান, কবিগান, টপ্পাগান, ঢপকীর্তন জাতীয় অবক্ষয়িত বা অবচয়িত শিল্পচর্চায় মশগুল থেকেছে বাঙালি। জমিদার, নবোদ্গত বেনিয়া মুৎসুদ্দি শ্রেণি নানা বিদেশগত এবং দেশীয় আমোদপ্রমোদ বিলাসব্যাসনেও কাল কাটিয়েছেন। সবদিক থেকেই উনিশ শতক বাঙালির জীবনে নানা রঙে রঙিন নানা গন্ধে আমোদিত, নানা সুবাসে সুবাসিত, নানা প্রকাশে-বিকাশে উচ্ছ্বসিত। এই উনিশ শতক বাঙালির জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আজকে যদি Treasure Within (Delors' Report UNESCO)-এর সন্ধান করা হয় তাহলে দেখা যাবে এই সময় একাধারে ভোগের রক্তরাগে আবার ত্যাগের ক্ষেত্রেও নতুন শপথে উজ্জ্বল।

তাই উনিশ শতক নিয়ে, শতকের বাঙালি জীবন মন, মনন, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, অপকীর্তি সবকিছু নিয়েও আরও আলোচনা করা চলে। তাই বলা চলে—'কত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ/ তবু রঙ্গে ভরা।'

পত্রকাব্য বা লিপিকবিতার (Verse Epistle) পরিচয়

পত্র বা লিপির আকারে লেখা কাব্য-কবিতাই পত্রকাব্য বা লিপি কবিতা নামে পরিচিত। কোনো বন্ধু বা অনুরাগীর উদ্দেশে বাজে কথোপকথনের ভঙ্গিতে নীতি-দর্শন, সাহিত্যভাবনা বিষয়ক কাব্য-কবিতা যা Verse Epistle বা 'পত্রকাব্য' অভিধায় চিহ্নিত হয়, তার মূল প্রেরণা রোমক কবি Horatius Quintus বা 'Epistulac'।

এই হোরেসীয় লিপি কবিতার আরও নিদর্শন কবি বেন জনসনের (1572-1637 AD) 'Epistle to Dr Arbuthnot', Willium Hugh Auden (1688-1744) AD-এর 'New Year Letter', 'Epistle to a Godson' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বতন্ত্র লিপিকবিতার আর-এক ধারার সূচনা করেছিলেন আর-এক রোমক কবি Pulius Ovidius Nago বা Ovid (43 B.C-17%18 A.D)-এর 'Heroides' বা The Heroines এগুলি পুরাণ বা লোককথায় উল্লিখিত নায়িকাদের পক্ষ থেকে তাঁদের স্বামী বা প্রেমিকদের উদ্দেশে পত্রাকারে রচিত কবিতা।

কবি ডেট্রনের 'England's Heroical Epistles' এবং পূর্বোল্লিখিত আলেকজান্ডার পোপেরই 'Eloisa to Abelard' ওভিদীয় ধারার নিদর্শন।

নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রানি অ্যানের চিকিৎসক জন আরবাথনটকে সম্ভাষণ করে পোপ যে লিপিকবিতা লিখেছিলেন সেইটি হল 'Epistle to Dr. Arbuthnot'। আসলে রঙ্গব্যঙ্গের জগতে তাঁর(পোপ)যোগদানের ঘোষণাপত্র, সহজ কথ্যভঙ্গিতে অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পোপ এখানে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ড. আরবাথনটকে সামনে রেখে গড়ে তুলেছেন চমৎকার ও চাতুরিমণ্ডিত এক ব্যঙ্গকাব্য। এর একেবারে শুরুতেই কবিতালেখা কাগজ হাতে কবির বাড়িতে চড়াও হয়েছেন যাঁরা তাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ও বিব্রত কবির কণ্ঠ শোনা যায়—'Shut, Shut the door, good John! fatigu'd I said, Tye up the knocker, say I'am sick, I'am dead, The Dog-stare rages! nay'tis past a doubt, All Bedlan, One Parnassus, is let out;

Fire in each eye and papers in each hand. They rave, recite, and madden round the land.'

মধুসূদন, Petrarch, Aristo, Boilcan এরা সবাই পত্রকবিতা লিখেছেন। স্পেনীয় ভাষায় পত্রকাব্য লিখেছেন Garcilaso—'Epistola a Boscan' (1543 AD) এবং 'Epistola Moral a Fabio' (সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ)

ইংল্যান্ডে জনসনের পরে Vaugham, Dryden এবং Congreve হোরেসীয় ঘরানায় Epistle লিখেছিলেন। এ ছাড়াও বিশ শতকে ইংরেজ কবি লুই ম্যাকনিস 'Letters from Iceland' পত্রকবিতা লিখেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে ওভিদের 'Heroides' অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন এক সার্থক পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ)। একটি চিঠিতে মধুকবি লিখেছিলেন—'It is my intention to finish this poem (বীরাঙ্গনা কাব্য) in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the 1st part must defray the expenses of printing the second?' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু)

ওভিদের সঙ্গে মধুসূদনের কিছু মিল দেখা যায়। ওভিদ যেমন—'Only when writing in the person of a woman...that he allows himself any approach to tenderness' মধুসূদন তেমনি নারীমুক্তির চিত্রকল্পে তাঁর সমস্ত লিরিক ক্ষমতা উজার করে দিয়েছেন।

মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রগুলির প্রেম ও কামনার বৈচিত্র্য ও মহিমময়তা, আনন্দ দুঃখ ইত্যাদি ওজস্বী কাব্যভাষায় রচনা করেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। রোমক কবি ওভিদের 'Heroides' অনুসরণ করলেও 'বীরাঙ্গনা' প্রাচীন কাহিনির নারী চরিত্রদের বহুবিচিত্র প্রেমকাহিনি আধুনিক জীবনরসে জারিত করে প্রকাশ করেছেন। অমিত্রাক্ষরের চমৎকার ব্যবহারে নায়িকাদের হৃদয়াবেগ আবেগঘন রূপে প্রকাশমান।

'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যে শকুন্তলা, তারা, কৈকেয়ী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, জনা, উর্বশী, রুক্মিণী, শূর্পণখা প্রমুখ নারীর প্রেমভাবনা বিবিধ বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত। উনিশ শতকে মানবমুক্তি এবং এইসঙ্গে নারীমুক্তির আকাশকে নানা রামধনু রঙে রঞ্জিত করেছিলেন মধুকবি। সমাজসংস্কারক রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে ভাবনা নারীমুক্তির দিক্‌নির্দেশ করেছিল মধুসূদন তারই সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিলেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারও অত্যন্ত সার্থক। পত্রাকারে লিখিত হলেও মধুসূদনের নায়িকারা রুদ্ধ ভাবাবেগ, দৃপ্ত আত্মঘোষণা, গভীরসঞ্চারী বেদনাবোধ, প্রবল উচ্ছ্বাস লিপি বা পত্রে 'নাটকীয় একোক্তি' বা 'Dramatic Monologue'-এর আকারেও রূপ দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রেই এগুলি ক্লাসিক

ধর্ম ছেড়ে আশ্চর্য নিটোল গীতিকবিতার ঝংকারে ঝংকৃত হয়েছে। ওভিদের তুলনায় মধুকবির নারী চরিত্রদের কাজকর্ম বহুলাংশে নাটকীয়। যেমন, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' পত্র উল্লেখ্য।

'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ কুলোদ্ভবা,
সত্যমিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।'

অন্যদিকে, 'Phyllis is to Demophoon' Epistle-এ 'I, your Phyllis, who welcomed you to Rhodope, Demophoon/complain that the promised day is past, and you not here.' এই দুটি পত্রকবিতায় মধুকবি ও ওভিদের মনোভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। যদিও 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে Heroides-এর অনুসরণ পাওয়া যায়। মধুসূদন ওভিদের অন্যান্য চরিত্রের ছায়া (যেমন Phyllis, Briseis প্রমুখের) শকুন্তলা, উর্বশী, তারা ইত্যাদি চরিত্রে গ্রহণ করলেও তাঁর রচনা মূলত দেশীয় ঐতিহ্যের ধারায় সজ্জিত।

মধুসূদনোত্তর কালে কবি রাজকুমার নন্দী মধুসূদনের অনুকরণে 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর' কাব্য লিখেছেন। যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন 'উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য'। এ ছাড়া ইংরেজ কবি ওডেন, ম্যাকনিস প্রমুখের মতো দূরবাসী কোনো ব্যক্তি বা নিকটে অনুপস্থিত কাউকে সম্বোধন করে পত্রকবিতা লিখেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেমন 'শিলঙের চিঠি', কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'পুরীর চিঠি', রাধারাণী দেবীর লেখা 'পরিণীতার কাব্য' আধুনিককালের উল্লেখযোগ্য পত্রকবিতা। এ ছাড়া পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লেখা কাব্য 'পাণ্ডব বিজয়', 'ভারতবৃত্তান্ত' প্রভৃতি। Episitle-এর ইংরেজি ব্যাখ্যা—A poem addressed to a friend are patron, thus a kind of 'letter' in verse. এগুলি দু-রকমের মূলত : (১) প্রধানত নীতি বা দার্শনিক ভিত্তি অনুযায়ী লেখা পত্রকবিতা বা কাব্য এবং (২) রোম্যান্টিক বা সেন্টিমেন্টাল আদর্শানুযায়ী পত্রকবিতা।

পত্রভিত্তিক আর-এক রূপ হল পত্রোপন্যাস বা Epistolary Novel। এই প্রসঙ্গে তা আলোচিত হবে না। বারান্তরে হলেও হতে পারে।

উপনিবেশের কালে বাংলা গদ্যসাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা: সময়কাল ১৭৬৫-১৯৪৮

উনিশ শতকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের নানা শাখার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। ভ্রমণসাহিত্য বা ট্রাভেলগ তাদের অন্যতম। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ এক নতুন মাত্রার সূচনা করে। বণিকশক্তি রাজশক্তিতে উত্তীর্ণ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের নানা স্থানে কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার তাগিদেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দেখা দিতে থাকে। প্রথমে জলপথ ও তারপরে স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের ছয়ের দশকের গোড়ায় (১৮৬৪) ভারতে বোম্বে থেকে থানে রেলপথ চালু হয় ও তার পরের বছরই বাংলা প্রদেশে রেলপথের সূচনা হয়। ভারতীয়রা দেশ ও বিদেশের দিকে পাড়ি দিতে শুরু করল এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাময়িক পত্রের আত্মপ্রকাশে তার ভ্রমণ বিষয়ক রচনারও প্রকাশস্থান হয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে উনিশ শতকে ভ্রমণ বিষয়ক নানা বইপত্র বেরোতে শুরু করল। গড়ে উঠতে লাগল বাংলা ভ্রমণসাহিত্য।

এর আগে বাংলায় নবজাগরণের কালে ইউরোপীয় ভ্রমণকাহিনিগুলি স্বরূপে বা অনুবাদে বাঙালি পাঠকের দরবারে এসে উপস্থিত হতে লাগল। মার্কো পোলোর বৃত্তান্ত, হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত ইত্যাদির সঙ্গে জোনাথন সুইফটের অনেকটা ভ্রমণ অ্যাডভেঞ্চারমূলক 'গ্যালিভার ট্রাভেলস্', ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড' ইত্যাদি অনেক বইপত্র ভ্রমণসাহিত্যের ধারণার বিস্তার ঘটাতে লাগল। ভ্রমণকাহিনি হিসেবে চিহ্নিত না হলেও বাংলা মঙ্গলকাব্যেই আমরা প্রথম ভ্রমণকাহিনির আভাস লক্ষ করি। পনেরো শতকে 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ও যথাক্রমে চাঁদ সওদাগর ও ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্তের ইঙ্গিত পাচ্ছি। তবে মঙ্গলকাব্যের ভ্রমণবৃত্তান্তে হয়তো কিছুটা কাল্পনিকতাও লক্ষ করা যাবে। এরপরে ষোড়শ শতকে রচিত 'চৈতন্যচরিত' কাব্যগুলিতে বাস্তবর্ণনার স্পর্শ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও লোচনদাস তাঁদের চৈতন্যজীবনীতে মহাপ্রভুর ভ্রমণের বিস্তৃত পরিচয়

দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ছাড়াও গয়া, কাশী, নীলাচল (ওড়িশা), দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা পরিভ্রমণ করেছিলেন। নানা কারণে এই ভ্রমণকথা বেশ বস্তুনিষ্ঠ হয়েছিল। এরপর সতেরো শতকে নরহরি চক্রবর্তীর কয়েকটি রচনাতেও ভ্রমণবর্ণনা আছে। এর মধ্যে দুটি বই হল—'ব্রজপরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'। ('ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থ)।

পরবর্তীকালে আঠারো শতকের শেষপর্বে কবি বিজয়রাম সেন লিখলেন 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য। কলকাতার ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে বহু লোকজন নিয়ে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে গঙ্গাপথে কাশীধাম গিয়েছিলেন। কলকাতার খিদিরপুরের গঙ্গার ঘাট থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেন। যাত্রার শুরুতে কবি বিজয়রাম নৌকোয় ছিলেন না। পথে ফুঁটিমারিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী হন। বিজয়রাম সেন জন্মেছিলেন নদিয়া জেলার ইছামতি নদীতীরের লোনাগঞ্জ (বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ) অঞ্চলে ভাজনঘাট নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। এই বইটিতে মঙ্গলকাব্যের নানা লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তীর্থভ্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। চাঁদপালঘাট, শিবপুরঘাট, বনমালি সরকারের ঘাট, বাগবাজার ঘাট, চিৎপুর বরানগর ডাইনে রেখে বালির ঘাট, শুকচর, ফরাসডাঙা হয়ে হুগলি, এরপর কুমারহট্ট (হালিশহর), কাঁচরাপাড়া, বলাগড় বাঁয়ে সোমড়াকে রেখে দিন তিনেক নৌকা চালাবার পর গুপ্তিপাড়া ও গোকুলগঞ্জ ছাড়িয়ে কালনা হয়ে নবদ্বীপ। প্রত্যাবর্তন অন্য পথে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নৌকো যেখানে যেখানে থেমেছে কবি সেইসব জনপদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বর্ণনা করেছেন সেখানকার দর্শনীয় স্থানের কথা, দেববিগ্রহ, বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষজনের কথা। মঙ্গলকাব্য নামাঙ্কিত হলেও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার পাশাপাশি মানবমাহাত্ম্যও ঘোষিত হয়েছে। বইটি নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় বইটিকে ভ্রমণকাহিনির মর্যাদা দিয়েছেন। আঠারো শতকেই ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের (১৭৫২-১৮২০) কাশীবাসের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ১৭৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় 'কাশীপরিক্রমা'।

এরপরে ফারসিতে লেখা 'শিগুরফ নামা-ই-বেলায়েত' (১৭৮১) নামে একটি ভ্রমণকাহিনির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এবং এর লেখক হলেন নদিয়ার পাঁচনোরের অধিবাসী এইতেশাম উদ্দিন মির্জা (মৃত্যু ১৮০১)। তিনি শাহ আলমের অধীনে কর্মরত থাকাকালে বাদশাহ তাঁকে ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জের কাছে পত্রবাহক হিসেবে পাঠান এবং তিনিই প্রথম ইউরোপ ভ্রমণকারী বাঙালি। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফেরেন এবং ওই বইয়ে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরে জেমস অ্যাডওয়ার্ড আলেকজান্ডার এই বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে লন্ডং

থেকে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় না হলেও এটি বাঙালি রচিত প্রথম বিলেত ভ্রমণকাহিনি।

এরপর রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) বিলেত যাত্রা করেন ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ৯ জানুয়ারি বর্তমানের শ্রীলঙ্কা হয়ে বিলেত যান। দ্বারকানাথের ভ্রমণকালে জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দেই ইংরেজি 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও বাংলা 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রামমোহনের বিলেতযাত্রার বছরেই 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) গয়াতীর্থ ঘুরে এসে 'শ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার' (১৮৩১) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁর পত্রিকার গ্রাহকদের বিনামূল্যে দেন। ঠাকুর পরিবারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কাশী (১৮৪৭), বর্মা (১৮৫০), ওড়িশা (১৮৫১), সুস্তীগিরি (১৮৫৭), ভজ্জী (১৮৫৮) প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন এবং যেগুলি পরে তাঁর 'আত্মজীবনী'তে (১৮৯৮) প্রকাশিত হয়। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের একস্থানে জানিয়েছেন 'চৈতন্য-নিত্যানন্দের পরম অনুগত ভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অভিরাম দাসের নিবাস খানাকুল-কৃষ্ণনগরের-আড়পার-রাধানগর গ্রামবাসী প্রাচীন জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫-১৮৭০)। ইনি দারুণ রোগে পড়িয়া উদ্ধারের আশায় উত্তরাপথে বহুদূর অবধি তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। যদুনাথ তাঁহার ভ্রমণকালে তাঁহার দৈনিক আচরণ ও অভিজ্ঞতা একটি খাতায় রোজনামচার মতো লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।' পরে এটি নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'তীর্থভ্রমণ' নাম দিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

(১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে) ১২৬১ বঙ্গাব্দে 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলাদেশ ভ্রমণে বের হন। গোটা পূর্ববঙ্গ সহ তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১২৬১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 'ভ্রমণকারি বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। (মোহনলাল মিত্র সম্পাদিত বইয়ের নাম 'ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র') প্রখর যুক্তিবাদী ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বিভিন্ন জেলার (রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, ভুলুয়া বর্তমান নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতির) ভৌগোলিক পরিসীমা, কৃষিযোগ্য জমি, রাজস্ব, সরকারি প্রশাসন, কারাগার, বিভিন্ন পরগনা ও জমিদার, রাস্তা, জনসংখ্যা, হাটবাজার, নদনদী, সদরঘাট, তীর্থস্থান, মেলা উৎসব, ব্যবসাবাণিজ্য, খাদ্যাভ্যাস, জীবজন্তু, শিল্পকর্ম, বিদ্যালয়, জলবায়ু প্রভৃতির কথা বলা হয়। এগুলি গেজেটিয়ারও হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যেই ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯),

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) ও বর্ধমান-রাজ মহাতাবচাঁদ এর (১৮২০-১৮৭৯) ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু সাময়িক পত্র যেমন 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), 'কল্পদ্রুম' (১৮৭৮), 'ভারতী' (১৮৭৭-১৮৮৪), 'নব্যভারত' (১৮৮৩), 'জাহ্নবী' (১৮৯৪),'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) প্রভৃতি পত্রিকায় বেশ কিছু ভ্রমণকাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাচরণ রায়ের (১৮৪৭-৯৭), 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' প্রকাশিত হয়। 'গঙ্গা' ধরে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে রচিত দেশ ও ব্যক্তির পরিচয় উপাদেয় ও নিখুঁত বর্ণনায় প্রকাশ পায়। বই আকারে প্রকাশের আগে এটি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) সম্পাদিত 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তীর্থভ্রমণের বাহিরে স্থান ভ্রমণের কাহিনিও বেশকিছু প্রকাশিত হয়েছিল। এই পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বইয়ের তালিকা এইরকম—'বাঙালির ইউরোপ দর্শন' (১৮৭৬)—রামদাস সেন, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৭৮)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পালামৌ' (১৮৮২)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিলাত প্রবাসী' (১৮৮৫)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 'আর্যাবর্ত্ত' (১৮৮৯)—প্রসন্নময়ী দেবী, 'ভূ-প্রদক্ষিণ' (১৮৯০)—চন্দ্রশেখর সেন, 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' (প্রথম পর্ব ১৮৯১-দ্বিতীয় পর্ব ১৮৯৩)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গৌড় ভ্রমণ' (১৮৯২)—রাজনারায়ণ বসু, 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' (১৮৯৩-১৮৯৪)—শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৮৯৪)—স্বামী বিবেকানন্দ, 'বিলাতের পণ্য' (১৮৯৬)—গিরিশচন্দ্র বসু, 'পরিব্রাজক' (১৯০০)—স্বামী বিবেকানন্দ, 'প্রবাসচিত্র' (১৮৯৯), 'হিমালয়' (১৯০০), 'পথিক' (১৯০১), 'হিমালয়বক্ষে' (১৯০৪)—জলধর সেন ('ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক), 'তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত' (১৮৯৯)—শরৎচন্দ্র দাস, 'দার্জিলিং এর চিঠি' (১২৯৬ বঙ্গাব্দ), 'গাজীপুর পত্র' (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)—স্বর্ণকুমারীদেবী, 'বোলপুর (১৩০০ বঙ্গাব্দ)—গিরীন্দ্র মোহিনীদেবী, 'ভ্রমণবৃত্তান্ত'—(প্রথম অগ্রহায়ণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ) দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' (১৮৮৫)—কৃষ্ণভামিনী দাস, 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর পত্র' (১৯০৩)—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 'ইংলণ্ডে বঙ্গবধূ' (১৯১০)—রাজকুমারীদেবী ইত্যাদি। এরপরে ভ্রমণকাহিনি আরও প্রতিষ্ঠালাভ করে। গিরিশচন্দ্র বসুর 'য়ুরোপ ভ্রমণ', অক্ষয়কুমার নন্দীর 'বিলাত ভ্রমণ' (১৯২৮), অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১), বিনয়কুমার সরকারের 'ইতালিতে বারকয়েক' (১৯৩২), জ্যোতির্মালাদেবীর 'বিলাত দেশটা মাটির' (১৯৩৬), দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'ইউরোপে তিন মাস (১৯৩৮), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০) 'ইউরোপ' (১৯৪৫) সৈয়দ মুজতবা আলির 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৮) অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ফেরা' (১৯৬৫) ইত্যাদি।

তালিকার ভ্রমণকাহিনির বেশির ভাগ ইংলন্ড বা ইউরোপ ভ্রমণের চিত্র। লক্ষণীয়

এই পর্বে বাঙালি মহিলা ভ্রমণকারীরাও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করছেন।

ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক তাৎপর্য, যেমন সমাজ, ধর্ম বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই স্বতন্ত্র। তাই ইংরেজি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক যুগে (ঔপনিবেশিক যুগও বটে) সাহিত্যের অন্যান্য শাখার লেখকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল 'ভ্রমণ বিলাসী ভাবনা'। ভ্রমণ এক চিরকালীন বৃত্তি, কিন্তু রোমান্টিক মানসিকতার ভ্রমণ একটি বিশেষ অনুভূতিতে নিষিক্ত হয়ে উনিশ শতকে বিশেষত এই ঔপনিবেশিক সময়ে এক নতুন চেহারা লাভ করল। প্রকাশ পেতে শুরু করল সুদূর বিশ্বকে মুঠোয় ধরবার বাসনা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যে দেখি সেই চিন্তার প্রকাশ—

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি মেখলায়।

রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

'ইচ্ছা সম্যক জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।'

অথবা—

'বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গৌড়ে।'

পরবর্তীকালে নজরুলের ব্যঙ্গোক্তি—

'বিলাত ফেরনি? প্রবাসী বন্ধু কন, এই তব বিদ্যা, ছিঃ।' পাশ্চাত্য শিক্ষা, মানসিক জড়তা অতিক্রম করার সাহস এইসব যেমন সেকালের ভ্রমণের প্রেরণা ছিল তেমনি শাসক প্রভুদের পিতৃভূমি দর্শনজনিত শ্লাঘাবোধও বাঙালিকে ইউরোপ ভ্রমণে উৎসাহ দিয়েছে, আর লেখা হয়েছে তার কাহিনি। এ ছাড়াও অনেকেই উপন্যাসের পূর্বসূরি হিসেবে ভ্রমণকাহিনিকেই বিবেচনা করেন। যদিও বিদেশি কাব্যে-কবিতায়ও ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে। ইংরেজি তথা ইউরোপীয় উপন্যাসেও ভবঘুরে ভ্রমণকারী নায়কপদে বৃত হয়েছে। বাংলায় 'শ্রীকান্ত' বা 'আরণ্যক' উপন্যাসেও ভ্রমণকাহিনির ছায়া আছে। সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সময় 'শ্রীকান্ত' ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনি'—তা নিয়ে স্বয়ং লেখকেরই দ্বিধা ছিল। এই জাতীয় তালিকা হয়তো আরও দীর্ঘ হতে পারে, যদিও এই আলোচনায় সেই কাহিনি অপ্রাসঙ্গিক।

ঔপনিবেশিকতা নানাভাবে অভিঘাত এনেছে বাংলা সাহিত্যে। ভ্রমণসাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ভ্রমণের আন্তর্জাতিক চিত্র রচনা, তীর্থভ্রমণের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নতুন ভ্রমণপথ সন্ধান, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যসন্ধানী ভ্রমণ ও তার কাহিনি রচনা বিশেষভাবে এই যুগ তথা মানসিকতার অবদান বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিত' বা কেশবচন্দ্র সেনের 'দৈনিক প্রার্থনা' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অগ্নিযুগের কোনো কোনো বিপ্লবীর স্মৃতিচারণা ভ্রমণের উপাদানে সমৃদ্ধ। যেমন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নির্বাসন কাহিনি' বা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তরের কথা'। উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে ব্যাপ্তিও জনপ্রিয়তা দুই-ই বেড়েছে ভ্রমণকাহিনির। আজ ভ্রমণকে আশ্রয় করেই একাধিক বাণিজ্যসফল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। (ভ্রমণ—স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী)

উনিশ শতকের জাগরণই আমাদের ভ্রমণের পথ বদলে দিয়েছে আর সেইসঙ্গে আত্মপ্রকাশের বাসনাকে তীব্রতর করেছে। তারই ফল-পরিণতি নানা ধারার ভ্রমণকাহিনি। যেমন চিঠিপত্রে ভ্রমণকাহিনি, আত্মজীবনীর অঙ্গরূপে ভ্রমণকাহিনি, চিত্রচরিত্রে (স্কেচ) ভ্রমণকাহিনি, ডায়ারির আদলে লেখা ভ্রমণকাহিনি, ক্ষুদ্র কাব্যোচিত ভ্রমণকাহিনি, ভ্রমণোপন্যাস, ভ্রমণেতিহাস ইত্যাদি।

চর্যায় কবিতা কবিতায় চর্যা

প্রথমেই লেখার নামে হোঁচট লাগতে পারে। তাও সংক্ষেপে বলা যায় প্রত্নবাংলার নিদর্শন চর্যাপদই কিঞ্চিৎ আলোচিত হবে। ১৯১১ সালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত 'The History of Bengali Language and Literature'-এ আদিপর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শনে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা উল্লিখিত হলেও গোপীচন্দ্রের গান, ডাক-খনার বচন ইত্যাদি কতকগুলি লৌকিক উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা তথ্য প্রাচীন বাংলার এই লুপ্ত রত্নোদ্ধার হয় অনেক পরে নেপালের রাজদরবার থেকে, যদিও উনিশ শতকে অনেক বিদেশি গবেষক Brian Hodgsonn, Eugene Burnouf, Daniel Wright, Cecil Bendall প্রমুখ নেপাল থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পুথি সংগ্রহ করেছেন, কারণ সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার একটা তাগিদ ছিল। আবার বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির সন্ধান করে ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামে একটি পুথির তালিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই ১৮৯৭-৯৮ সালে দুবার নেপালে গিয়ে কিছু সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধান করেন এবং ১৯০৭-এ নেপালের রাজদরবার থেকে তৃতীয়বারে কিছু পুথি আবিষ্কার করেন। এইগুলির মধ্যে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'সরহপাদের দোঁহা', অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজাম্নায়পঞ্জিকা' নামক টীকা এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামক টীকার পুথিগুলি পরবর্তীতে বাংলা রচনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলি একত্রে ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় এবং সমালোচক মহলে আলোড়ন তোলে।

চর্যাপদের সেই বিতর্কে ভাষা যেমন ছিল, চর্যার সময়কালও ছিল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছিলেন চর্যার সবশেষ রচনাকাল আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক।

অন্যদিকে মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও আন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে চর্যার সময়কাল

অষ্টম-দ্বাদশ শতক। পরবর্তীকালে শাস্ত্রীমশায়ের পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধতন্ত্র 'Sadhanmala' গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন। এ ছাড়া বাংলাভাষায় তাঁর 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' বইখানিও উল্লেখযোগ্য।

চর্যার পদের ভাষা অর্থের দিক দিয়ে দ্ব্যর্থক। কারণ এতে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক দুরকম অর্থই আছে। এই ভাষা আলো-আঁধারি বা সন্ধ্যাভাষা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'Obscure religious Cult of Bengal' বইয়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের এই লুপ্ত রত্ন সম্পর্কে কিছু কথা আলোচিত হবে। চর্যার পদে বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, অসমিয়া ও মৈথিলি ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। আবার চর্যার ভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত 'I must, however say that in some songs, Bengali elemenets predominate our very late forms occur in one and the same piece along with many archaic Bengali forms as well as Oriya and Maithili forms.' চর্যার আদি কবি হিসেবে কে আসবেন সে নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কারও কারও মতে সরহপাদ আদিতম, আবার কেউ কেউ মনে করেন লুইপাদ প্রাচীনতম কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রাপ্ত পুথিতে সাড়ে ছেচল্লিশখান্য পদ পাওয়া গিয়েছে, আবার মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা থেকে জানা যায় যে মোট চর্যাপদের সংখ্যা হল ৫০। যা হোক মুনিদত্তর টীকা দিয়ে চর্যার অর্থনির্ণয়ে কিছু ধাধার কথা বোঝা যায়, চর্যার আলোচনায় আচার্য নীলরতন সেনের কথাও আসে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ মনে করেন বাংলায় পাল রাজাদের আমলেই মূলত অষ্টম-দ্বাদশ শতক চর্যাপদ ও চর্যাকারদের সময়কাল। সাড়ে ৪৬ খানি চর্যা থেকে প্রায় ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এরমধ্যে কারও কারও ছদ্মনাম বা পরিচয়সূচক ব্যাপার আছে। কখনও নিজের জায়গায় গুরুর নাম আছে। কাহ্নপাদের পদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১২, ভুসুকুর ৬, সরহের ৮, কুক্কুরীপাদের ৩, আর একটি করে পদ আছে—ধুরূঅ, গুঞ্জরী, চাটিল, কামলী (কমলাম্বর), জেম্বী, মহ্নিআ, বীণা, আজদেব, ঢেন্ডন, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কন, জয়নন্দী ও ধামর, দুটি করে পদ আছে লুই, শান্তি, শবর প্রমুখের। মূলত সহজিয়া সাধনার পদ এগুলি। অধিকাংশই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত। পয়ারের মতো অন্ত্যানুপ্রাস আছে। প্রত্যেকটি চর্যায় রাগের উল্লেখ আছে। যেমন, 'রাগ পটমঞ্জরী', 'রাগ জবড়া', 'রাগ অরু', 'রাগ গুঞ্জরী', 'রাগ ভৈরবী' ইত্যাদি। তখন এগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হত, তা আজ আর বোঝার উপায় নেই। তবে বাঙালির প্রাণের সহজ গীতিপ্রবণতা এই পদগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুমুখী সাধনার তথা তন্ত্রসাধনায় কিছু গোপন সূত্রের ইঙ্গিতও দেয় এই পদগুলি। চর্যার সূচনার পদটি যা লুই-এর নামে চিহ্নিত—

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।
সঅল (সমা) হিঅ কাহি করি অই।
সুখে দুখেতে নিচিত মরিঅই।।
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ বারণ কপটের আস।
সুনু পাখ ভিড়ি লাহরে পাস।।
ভুণই লুই আম্ হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।।

অর্থাৎ দেহ (কায়া) তরুবরের পাঁচটি শাখা (ডাল)। চঞ্চল চিত্তে কাল উপবিষ্ট হয়। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাপ করো, (লোহিত) লুই বলছেন গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো। সকল সমাধা হল, কেন করা যায়? সুখে দুঃখে নিশ্চিত মারা যায়। ছলাকলা করা কপটের আশা এড়ানো হল, শূন্য পক্ষ পাশে অঙ্গে অঙ্গে চেপে নাও। (লোহিত) লুই বলেছেন, আমি সজ্ঞানে দেখেছি, ধমন চমন দুই পিড়িতে উপবিষ্ট। আবার, রাগ জবড়া-কুক্কুরীপাদের পদ—

দুলি দুহি পিটা ধরন না জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।।
আঙ্গণ ঘরপণ সুণ ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী।।
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।

বঙ্গার্থ : মাদি কাছিমকে দুইয়ে কেঁড়েতে রাখা যায় না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়। উঠোন যদি ঘর হয়, তবে শোন হে নিলাজ নারী, মাঝরাতে কানের দুল চোরে নিল,কোঠায় গিয়ে চাই (মাগি)।

আশ্চর্য সহজ উপমা।

আবার কম্বলাম্বর পাদের একটি পদে পাই,

সোণে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই মহিকে ঠাবী।।
বাহ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই কইসেঁ।
খুন্টি উপাড়ী মেলিলী কাচ্ছী।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছী।।

মাঙ্গত চড় হিলে চডদিস চাহঅ,
কেড়ুআল নাহি কেং কি বাহবকে পারঅ।।

বঙ্গার্থ : সোনায় পূর্ণ করুণার নৌকো। মাটিতে তাই রুপা রাখি। কম্বলিক (কামলি) তুই আকাশের উদ্দেশে বেয়ে চল। জন্ম গেলে ফিরে আসে কীভাবে? পরিধেয় কাপড়ের খুঁট খুলে কাছা খুলে মিলিত হলাম। কম্বলিক (কামালি) ভালো গুরুকে জিজ্ঞাসা করে তুই প্রেম বয়ে চল। এই পদের অনুরণন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি...' —নাম কবিতায় কি পাওয়া যায় না।

কাহ্নপাদের আর-একটি পদ হল--'রাগ দেশাখ' এ সজ্জিত,

'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়ি আ।
ছুই হোই যাই সো বাহ্ন (ণ) নাড়ি আ।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ বহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।

বঙ্গার্থ : ওরে ডোমনি নগরের বাইরে তোর কুঁড়েঘর। সেই ব্রাহ্মণ যে নেড়া সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ইত্যাদি। আশ্চর্য রূপকল্প বা ইমেজারি।

অথবা,

টলিত মোর ঘর নাহি পড়বেশী
হাড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।

আমি টিলায় বাস করি, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ নিত্যদিন অতিথি আসে। ইত্যাদি অদ্ভুত চমৎকার চিত্রকল্প। তেমন সহজ ভাষারূপ। আরও মনে পড়তে পারে ভুসুকুর সেই বিখ্যাত পদ—

কাহেরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল ডাক পড়অ চৌদীস।
অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনতা ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।

বঙ্গার্থ : কাকে নিয়ে ছেড়ে কীসে আছি। ঘিরে ফেলে চারদিকে হাঁক পাড়ে। নিজের মাংসের জন্যই হরিণ আপনার শত্রু। ক্ষণিকের তরে তাকে শিকারি ভুসুকু ছাড়ে না। মানবজীবনের এক বিরাট সত্য এখানে লুকিয়ে আছে। লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদ অবলম্বনে গল্প লিখেছেন 'চর্যাপদের হরিণী'।

আবার ভুসুকুরই আর-একটি পদ—

বাজনার পাড়ী পউঁআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দশ লুড়িউ।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।

ণিঅ ঘরিনী চণ্ডালেঁ লেলী।।

বজ্র নৌকায় পতিত হয়ে পদ্মা খালে বাহিত হল। অদয় দস্যু দ্বারা দেশ লুণ্ঠিত হল। আজ ভুসুক অসহায় হল। নিজের ঘরনিকে চণ্ডালে নিয়ে গেল। এই চর্যাচিত্রে তখনকার সামাজিক অস্থিরতার আশ্চর্য সুন্দর চেহারাটি ব্যক্ত হয়েছে। চর্যাই হল অবগুণ্ঠিত বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশিত রূপ, যা বহুকাল পরে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাঙালি এর কথা জেনেছে, মেনেছে বিশ শতকের প্রথম ভাগে, তাও আবার নেপাল রাজদরবার থেকে পাওয়া পুথির সাহায্যে।

কয়েকটি মূল্যবান বইয়ের হদিস:

১. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৩।

২. চর্যাগীতি পদাবলী, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬।

৩. নব চর্যাপদ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬।

৫. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়,কলকাতা, ২০০১।

৬. The Origin And Development of the Bengali language, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯২৬।

৭. Materials for a critical Edition of the Old Bengali *Charyapadas* comparative study of the text and the Tibetan Translation), Part I, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, Journal of the Department of Letters, Vol XXX, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮।

সাহিত্যে বাস্তবতা ও অবাস্তবতা : একটি অণুভূমিকা

সাহিত্য জীবনের দর্পণ কিনা এই নিয়ে সংশয় আছে। কারণ নির্বিশেষে জীবনের বিবৃতি সাহিত্যের বিষয় বা আধার হতে পারে কিন্তু সাহিত্যে অবাস্তবের রসের ভিয়েন না চড়লে তা জীবনের চিত্ররূপ হলেও মহৎ সাহিত্য হওয়া তার পক্ষে দুষ্কর। কবিকণ্ঠে একবার উচ্চারিত হয়েছিল, 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'। অর্থাৎ বাস্তব বা Real এবং অবাস্তব বা Unreal (কখনও Imagination, fancy) এদের সম্পর্ক আধার আধেয়ের। কখনও এমিল জোলার naturalism আবার Reality-এর কাছাকাছি। যদিও সাহিত্য মানেই হ'ল নতুন সৃষ্টি। 'অপার কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতি' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো কাব্য তথা সাহিত্যসৃষ্টি গণ্য। তবে সাহিত্য শুধুমাত্র বাস্তবের বর্ণনা বা বিবৃতি হতে পারে না। যা হতে পারে রিপোর্টাজ। সুতরাং সাহিত্যে বাস্তব ও অবাস্তব যুক্তবেণির মুক্তবন্ধনের মতোই হতে হবে। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড যেমন লঘু কল্পনা ও জীবনবাস্তবতার ছোঁয়ায় সাহিত্য— যে-কোনো মহৎ সাহিত্যেও তাই উদ্দেশ্য হবে। সারা পৃথিবীতে সাহিত্যে বাস্তবতা ও অবাস্তবতা কার প্রাধান্য মান্য—এই নিয়ে চুলচেরা তর্কবিতর্ক হয়েছে। এসেছে 'Arts for Art's Sake' (কলা কৈবল্যবাদ), আবার এসেছে 'Arts for Life's Sake' (জীবন-বাস্তবতাবাদ)। তবে সাহিত্যে বাস্তব কতটা থাকবে আর অবাস্তবই বা কতটা থাকবে এর সীমারেখা নির্ণয় সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। করলে তা গা-জোয়ারিরই নামান্তর হয়ে ওঠে, এগিয়ে চলার মন্ত্রেই তাতে বেনো জল যেমন আসবে তেমনি আসবে স্ফটিকের দ্যুতিময় জল—যাতে আরশির মতো জীবনের অভিমুখ প্রতিফলিত হবে। ভাঙা আরশির কাচে যেমন খণ্ড ছবি ফুটে ওঠে তেমনি অবাস্তবের আঁকিবুকিতেও সাহিত্যভোক্তা জীবনে বাস্তবেরই জলছবির সন্ধান করে। কিন্তু জলছবি একরঙা না হয়ে রামধনুর মতো সাতরঙা হলেই ভালো হয়। রসভোগের আয়োজন সাহিত্যের পরতে পরতে। তাই সাহিত্য হুবহু আজকালের জীবনবিবৃতি মাত্রই হতে পারে না। তাতে থাকবে পড়ন্ত বিকেলের শেষ রোদ্দুরের মিঠে আলো যা জীবনের কঠোর রুদ্রময় মাঝদুপুরে অন্তরালবর্তী স্নিগ্ধতারই আভাস দেবে। সাহিত্যশিল্পী তাই বাস্তবের

ক্যানভাসে কল্পনার রং মিশিয়ে বাস্তব জীবনেরই বড়ো ছবি ফুটিয়ে তুলবেন। শিল্পীর মনের অণুবীক্ষণে বাস্তবের পঙ্কিল চেহারা থাকলেও শিল্পের আঁচলে পাঁকের দাগ লাগালে তা সাহিত্য পদবাচ্য হলেও মহতী সৃজন হতে পারে না। কারণ সাহিত্যে জীবনের সব রং নিভে গেলেও 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার' প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবকাশ। পোড়া গন্ধময় বাস্তবতার বুক চিরেও ভাস্বর হয়ে ওঠে কল্পনা ও অবাস্তবতার একটুকরো অঙ্গার। এসব বলার পরেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বাস্তবতা ও অবাস্তবতার মাত্রা নির্ণয় সহজ কাজ নয়। যা ভাবায় না সেই সাহিত্যের গভীরতাও বিচার্য নয়। আবার গভীরতা মানেই শুধু বাস্তবের অনুপুঙ্খ ডিটেলিং নয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব অনেকদিন ধরেই চলেছে। এই সমস্যা মিটবার নয়—এ যেন এক সমস্যমান পদ বিশেষ 'শেষ হয়ে না হইল শেষ'।

সাহিত্যপাঠকের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা ও অবাস্তবতার দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। সবুজপত্র, কল্লোল, কালিকলম, পরিচয়-এর যুগেও তা ছিল আর আজকের কালেও তা আছে। আজকের Instant making-এর তালে তা সহজে আমাদের ভাবায় না। বাস্তব আজ নগ্নতায় পর্যবসিত হলেও আমাদের কাঁদায় না। কিন্তু বাস্তবের প্রবল ধাক্কায় চিরন্তন 'হৃদয়ে কি জঙ ধরে পুরনো খাপে?' কোনো বিশেষ সাহিত্যরূপ ধরে আলোচনা না করলেও অথবা কোনো একটি বা একাধিক বিশেষ লেখা ধরে আলাপচারিতায় মগ্ন না হয়েও আমরা বুঝতে পারি শুধু বাস্তবের চচ্চরি সাহিত্যের পাকশালের একমাত্র বিষয় যেমন নয় আবার অবাস্তবের ঘন আস্তরণও সাহিত্যের মুখচ্ছবি নয়। এও এক ফ্যালাসি। দুয়ের মধ্যে কে বড়ো তা মূল আলোচনায় না এলেও সাহিত্যের দরবারে দুজনায় আসর জমায়। বাস্তব-অবাস্তব নিয়ে মারামারি কাটাকাটি না করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুজনায় থাকুক—এই আমাদের কাম্য। তবে সাহিত্যে এদের পরিমাণ গণিতের মতো সমানুপাতী বা ব্যস্তানুপাতী হওয়া সমীচীন নয়, হতে পারে তা প্রয়োজনের সৌন্দর্যে সমাসীন।

ব্যর্থ মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার'

উনিশ শতকে বাঙালির ইতিহাস গদাইলশকরি চালের ইতিহাস, নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বা রিভাইভালিজমের যুগ। এরই ফলস্বরূপ দেশ ও জাতির পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরে দেখার একটা আয়োজন হয়েছিল। তবে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি একটা বিদ্বেষ এবং স্বাধীনতার স্পৃহাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহিত্যের চর্চায় ছাপ রেখে গিয়েছিল। উনিশ শতকের সেই যুগ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—'উনিশ শতকে বাংলায় নূতন যে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য, জাতীয়তা ভাবের স্ফূরণ ও রাজনীতিক চেতনার উদ্‌বোধন। ইংরেজিতে nationalism (জাতীয়তা) বলিলে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব মধ্যযুগে ছিল না, প্রাচীন হিন্দু আমলেও ছিল কিনা সন্দেহ।' (বাংলা দেশের ইতিহাস/আধুনিক যুগ/একাদশ অধ্যায়—দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক আন্দোলন, পৃ.৪৯৬ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা.লি. ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ।)

হয়তো বা এই জাতীয় জাগরণের কারণেই উনিশ শতকের বাংলায় মহাকাব্য রচনার একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই জাতীয় মহাকাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic বলা হয়ে থাকে। একে 'সাহিত্য সন্দর্শন'কার Imitative Epic বলেও উল্লেখ করেছেন। (সাহিত্য সন্দর্শন : বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা পৃ. ৫১ শ্রীশচন্দ্র দাস, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য (১৮৬১ খ্রি.) প্রথম এই মহাকাব্য রূপে আত্মপ্রকাশ করল। যদিও আমরা জানি যে, মধুসূদনের মহাকাব্য আকৃতিতে ছোটো, যদিও সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র নির্ধারিত 'সর্গ অষ্টাধিক ইহ'—এই শর্ত মেনেই নয় সর্গ বিশিষ্ট। যদিও ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের নায়ক ভাবনা থেকে মধুসূদনের নায়ক ভাবনা বিপরীতধর্মী। এ বিষয়ে মধুসূদনের ভাবনাও অত্যন্ত পরিষ্কার 'I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan' এমনকি একই চিঠিতে মধুসূদন আরও বলেছেন যে, তিনি একে মহাকাব্য মনে করেন না—'You must know, my dear

fellow, judge of the work as a regulasee Heroic poem. I never meant it such.' এ কারণেই 'সাহিত্য সন্দর্শনেই লেখা হয়েছে—'মধুসূদনের মন ক্লাসিক কাব্যবিলাসী হইলেও, তাঁহার কবিপ্রাণ ছিল প্রধানত রোমান্টিক। এই কারণে আকারে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য মহাকাব্যোচিত হইলেও ইহার প্রাণনন্দিনী সম্পূর্ণ রোমান্টিক, এবং মধুসূদন এই কাব্যে জীবনের যে জয়গান করিলেন, তাহা বীররসের নয়, করুণ রসের। কবি তাই 'সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।' (তদেব, পৃ.৫৩)

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের পরই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য অভিধায় ভূষিত। যদিও হেমচন্দ্রই প্রথম 'মেঘনাদবধ' কাব্যের টীকা সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন এবং এর পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণে তিনি এই কাব্যের প্রশংসা করেও মেঘনাদবধ আকারে ছোটো, এর বিষয় ভারতীয় মহাকাব্যের সংস্কৃতি বিরোধী এবং একটানা অমিত্রাক্ষরের একঘেয়েমিতে আক্রান্ত বলেও মন্তব্য করেছিলেন। তাই নিজের 'বৃত্রসংহার'-এর প্রথম প্রকাশকালীন ভূমিকায়/বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—'নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদবিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল্টন প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক নৈকট্য সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।...বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের কাব্যাঙ্করণ এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতা দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।' লক্ষ করলে দেখা যায় যে হেমচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্য স্ববিরোধী বক্তব্যে পুষ্ট।

যা হোক, উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে সমালোচকদের বক্তব্য এরপর শোনা যাক পরপর। প্রথমেই দেখা যায় এরকম মন্তব্য 'Hemchandra's literary debt to the West is apparent even in this work as well.' (Western Influence on 19th Century Bengali Poetry (1857-1887) H. M. Dasgupta. page-56, Chakrabarty, Cheterjee & Co Ltd. 1935 A/D.) আবার P.R. Sen তাঁর Western Influence in Benegali Liferature গ্রন্থে লিখেছেন—'Vritrasamhar (the first part of which came out in 1875),

Conforms more closely to the form of the western epics in point of length in which it surpasses all previous attempts. Its diction, terse and sombre, is conducive to the solemn atmosphere intended by the author and proper for the epic.' (page-195, University of Calcutta published, 1932 A.D.)

দেবাসুরের দ্বন্দ্বই হল হেমচন্দ্রের বৃহৎকাব্য 'বৃত্রসংহারের (১-১১ সর্গ ১৮৭৫, ১১-২৫ সর্গ ১৮৭৭) বিষয়। ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের নৈতিক শক্তি, তাঁর তপস্যাতেই নিয়তি অনুকূল হবেন এবং মহামুনি দধীচি আত্মত্যাগ করে তাঁর অস্থিতে বজ্র নির্মাণের সুযোগ দেবেন বিশ্বকর্মাকে এবং সেই বজ্রেই বৃত্রসংহার সম্ভব হয়েছিল। 'কিন্তু দধীচির আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বর্গ উদ্ধার—এই বিষয়বস্তুতে 'মহাকাব্যের বিশালতা' থাকলেও রচনার দিক থেকে কবিপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তার কারণ হেমচন্দ্র বিদেশি ভাবের সংগ্রাহক, অনুবাদক, অনেক দিক থেকে অনুগামী; কিন্তু যে জীবনদৃষ্টির নতুনত্বে মাইকেলের পক্ষে 'transvaluation of ideals and a Changed condeption of Character' সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল, তা হেমচন্দ্রের ছিল না। ফলে বৃত্রসংহারের চরিত্রগুলি যেন কপট প্রেরণায় উচ্ছসিত, অনুভূতির প্রকাশের চেয়ে প্রকাশের ভঙ্গির দিকেই তাদের নজর বেশী'। (বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, সংস্কৃতি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) 'মধুসূদনের অনুসরণে যাঁহারা মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার শ্রেষ্ঠ। সাধারণ পাঠকের কাছে বৃত্রসংহারকে ছন্দের সহজ লালিত্য রচনায় প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সরলতা সবিশেষ সহজগ্রাহ্য করিয়াছিল। কোনো কোনো সমসাময়িক সমালোচক বৃত্রসংহারকে মেঘনাদবধের ওপরে স্থান দিয়াছিলেন। বৃত্রসংহারের আখ্যানবস্তুতে মহাকাব্যোচিত যে বিশালতা আছে তাহা মেঘনাদ বধে নাই। এই কারণেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের তুলনায় বৃত্রসংহারকে উচ্চতর স্থান দিয়াছিলেন। স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থি দান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।' (ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী, জ্ঞানাঙ্কুর, কার্তিক, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ)। 'কিন্তু বৃত্রসংহারের আখ্যান বস্তুর বিশালতা কাব্যের মধ্যে কতটা প্রতিফলিত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা অবশ্যক। দধীচির অস্থিদান বৃত্রসংহার-কাহিনির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যে এই ব্যাপার নেপথ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে। দধীচির মহত্ত্বের পরিচয় কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত—বৃত্রসংহারে বৃত্রের অপরাধ এমন গুরুতর নয় যাহাতে তাহার অকালনিধনের জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন হইতে পারে; ঐন্দ্রিলার অপরাধে বৃত্রের অমন শাস্তি ও সমুচিত হয় নাই। কাব্যের নাম যদি 'ঐন্দ্রিলা পরাভব' হইত তবে অন্যায় হইত না।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয়

খণ্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ ১ বৈশাখ, ১৪০১) ড. সুকুমার সেনের এই মন্তব্য থেকে বৃত্রসংহার কাব্যের কবির প্রতিভা নির্ণীত হয়। যদিও সুকুমার সেনের আগে ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে। কিন্তু পরেই আমরা সেই মন্তব্যটিকে লক্ষ করব। তার আগে ড. সেনের মন্তব্যের 'কোন কোন সমসাময়িক সমালোচক বৃত্রসংহারকে মেঘনাদবধের উপরে স্থান দিয়াছিলেন' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আগেই উল্লিখিত এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য (বৃত্রসংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন। ১২৮১ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বৃত্রসংহারের সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বাঙালি পাঠককে হেমচন্দ্রের অপুর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। আমরা সেই সমালোচনার অংশবিশেষ উল্লেখ করলাম)—'হেম বাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না।...তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব।...এই মহাকাব্যের বিষয় ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই...অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন।...অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী।...অপরখণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেমবাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।...আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)।

বর্তমানে অনেকেই উপরোক্ত মতের সঙ্গে একমত পোষণ করবেন না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের আতিশয্য বাদ দিয়ে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার নির্মোকভাবে বিচার করার চেষ্টা করবেন, বলা বাহুল্য সেটা এই কাব্য বিচারের কাম্য পথ।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক মন্মথনাথ ঘোষ 'হেমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন—'বাঙালী যাহা চায় হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।' (পৃ. ৩৫)

অন্য সমালোচক বলেছেন—'বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিপতাকা। মধুসুদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের ক্লাসিক কল্পনার সিংহদ্বার যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, এই কাব্যের বজ্র গম্ভীর ও ললিত মধুর শব্দমন্ত্র এবং উদাত্ত সঙ্গীতধর্ম যাহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই, তাহারা বৃত্র সংহারের বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়াছে। বৃত্রসংহার যেন মেঘনাদ বধ কাব্যের শিশু সংস্করণ। তাই রস ও রুচি যাহাদের খুব সুক্ষ্ম নয়, তেমন রসিকেরাই বৃত্ত সংহারের ন্যায় কৃত্রিম

আড়ষ্ট কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। মেঘনাদ বধ কাব্যের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে বৃত্রসংহার কাব্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করা যাইত, কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের রস মন্দাকিনীতে একবার অবগাহণের পর আর কেহ বৃত্রসংহারের পল্বলে অবগাহন করিতে চাহিবে না।' (আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়—মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ)। দেখা যাচ্ছে যে অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোরভাবে মেঘনাদবধ কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে বৃত্রসংহারে মহত্ত্ব নির্ধারণ করতে চেয়েছেন এবং যে সমস্ত সমালোচক মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন মহাকাব্যকার হিসেবে, সেখানেও তা যে কত বড়ো ভ্রান্তিমূলক তা তিনি কঠিনভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সমালোচক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তর মতে 'বৃত্রসংহার কাব্য হল মহাকাব্যের সর্বলক্ষণ যুক্ত আদি-মধ্য-অন্ত কাহিনী অবলম্বী গার্হস্থ্য জীবনরসের কাব্য'।

যা হোক আমরা বৃসংহার মহাকাব্যের সংক্ষেপে সামগ্রিক সত্তা বিচারের কাজে নিযুক্ত হব এবং সেখানে আমরা উনিশ শতকীয় বাংলা মহাকাব্য রচনার অবকাশে এই কাব্যের বিচার করে দেখব। বাস্তবিক পাশ্চাত্য সমালোচকেরা যাকে Epic of Art বলেছেন সেই জাতীয় রচনাই হল বাংলায় হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার। আবার একেই কোনো কোনো সমালোচক Imitative Epic হিসেবে উল্লেখ করেছেন—'It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary culture on lines already laid down.'

বৃত্রসংহার কাব্যের চরিত্রালোচনায় দেখা যায় যে, হেমচন্দ্র দেবতা এবং ঋষি চরিত্রের বিপরীতে অসুর চরিত্রাবলি সাজিয়েছেন। দেবতা চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রপত্নী শচী, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত, শচীর সখী চপলা, রতি, ভৃত্য কন্দর্প, ঋষি দধীচি এবং অন্যদিকে স্বর্গমর্ত্য পাতাল জয়ী বৃত্রাসুর, তার পত্নী ঐন্দ্রিলা, পুত্র রুদ্রপীড়, রুদ্রপীড় পত্নী ইন্দুবালা। ইন্দ্র ভারতীয় আদর্শে রচিত দেবচরিত্র। শচী ইন্দ্রাণী সুলভ মহিমায় চিত্রিত। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত বীরত্বে উজ্জ্বল, দেবতা শিব, রতি, কন্দর্প সহজভাবেই অঙ্কিত। অন্যদিকে অসুর চরিত্র হিসেবে বৃত্র অচল, অটল কিন্তু কিয়দংশে দুর্বল পিতা এবং পত্নীগতপ্রাণ পতি। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা ঈর্ষাতুর, দাম্ভিক, নীচ ও শঠ চরিত্র হিসেবে চমৎকারভাবে বর্ণিত। দধীচি ঋষি হিসেবে স্পষ্ট চিত্রিত নন। মধুসূদনকে অনেকাংশে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন হেমচন্দ্র। যদিও মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ'-এর রাবণ ছিলেন Grand fellow, সেখানে বৃত্র কোনোমতেই রাবণের সমকক্ষ নন। রাবণপুত্র মেঘনাদ মধুসূদনের চেষ্টায় Tragic Hero, কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় পত্নী ইন্দুবালা আকাশ আর পাতাল দুই মেরুর চরিত্র। শুধুমাত্র ইন্দুবালা বিভীষণ পত্নী সরমার সঙ্গে খানিক সম্পর্কান্বিত হতে পারে। অন্যদিকে রাবণপত্নী, চিত্রাঙ্গদা বা মন্দোদরীর সঙ্গে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলার মিল খুবই কষ্টকল্পনা। কিন্তু তাই বলে বৃত্রসংহারের নিজস্বতা বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ হেমচন্দ্রের মহাকাব্যিক

বিষয়ভাবনা Lofty ছিল, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে ও সাধারণ মহাকাব্যজনোচিত ভালোর অবশেষে জয় ও মন্দের পতন এই উপসংহারেই শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে আর-একটা কথাও বলা যেতে পারে যে, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের আগে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' রচিত হলে কাব্য বা মহাকাব্য হিসেবে এটির অবস্থা যথাযথ হত, কেন-না চমৎকার একটি রচনার পর অনেকাংশে দুর্বল একটি অনুকরণ বা অনুসরণ অনেকাংশেই বিশিষ্টতা লাভ করে না, যা লাভ করে তা হল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় স্থানলাভ।

বৃত্রসংহার কাব্যের কিছু কিছু অংশ আলোচনা করে হেমচন্দ্রের কাব্যরচনা প্রয়াসের আলোচনা করা যেতে পারে।

মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণের বিরাট চরিত্রের আড়ালে কখনোই ঢাকা পড়ে না রাবণ তনয় মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু বৃত্রসংহারে বৃত্রের বৃহৎ চরিত্রের ছায়ায় ঢাকা পড়ে পুত্র রুদ্রপীড় বলে—

জন্ম বৃথা! কর্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্বলোকে—
জীবনে জীবন অন্তে চিরস্মরণীয়,
বিভব, ঐশ্বর্য, পদ সকলি যে বৃথা;
পিতৃভাগ্য ভোগ্য যদি হয় তনয়ের;—
শূন্য গেহ কোন কালে নহে কোন লোকে
জলবিম্ববৎক্ষণে ভাসিয়া মিশায়।

আবার বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনায় চমৎকার কবিচেতনা যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার নিরিখে—

'গভীর ধনী গর্ভে, গাঢ় তমোময়,
নির্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত
বিশ্বকর্মা-শিল্পশাল, ভীম শব্দ তার
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি' শ্রবণ;
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি সুর্মী; নিনাদি বিকট
সহস্র-বাসুকি গর্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধ ধাতুস্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।'

দেবাদিদেব মহাদেব বৃত্রের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন

'ধরিলা সংহার মূর্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জিয়া সংহার শূল করিলা ধারণ,

তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।'

কবির প্রতিশ্রুতি মতো কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য আনতে ও ছন্দ ব্যবহারে একঘেয়েমি কাটাতে অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয়। সেখানে ছন্দসৌন্দর্যের পরিবর্তে ছন্দ শৈথিল্যই নজরে পড়ে, যা মহাকাব্যের ওজস্বীতার পরিপন্থী।—

'নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্ধচেতনের সঙ্গে
অদূরে মুরলিধ্বনি বাজিলে যেমন
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া
পরানেতে জড়াইয়া
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত শ্রুতি-কুহরে
তেমনি প্রবেশ করে
শরীর সে সুমধুর কোমল বচন।'

বৃত্রসংহারের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল কিছু হীরকদ্যুতির মতো পঙ্‌ক্তিও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদ গান,
উচ্চে হরিসংগীর্তন মধুর গম্ভীর
ভাষাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে;

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে দেবতাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ঋষি দধীচি সানন্দে তনুত্যাগ করলেন—এই বর্ণনায় কবিকল্পনা সংযত, সংহত, লক্ষমুখী।

বৃত্রসংহার মহাকাব্যে কবির কল্পনারম্ভ পরনির্ভরতা দিয়ে। আবার সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যে দান্তের 'ইনফার্ণো'র গল্প থেকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' ছোঁয়াচও লক্ষ করেছিলেন। যা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রণীত 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩১৯ সালের সংখ্যায় প্রাপ্তব্য। হয়তো উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করেই সমালোচক ড. সুকুমার সেন লিখেছিলেন—'বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য থাকায় বিশেষ লাভ হয় না, বরং বিষয়োচিত গাম্ভীর্য ও উদাত্ততার হানি হইয়াছে। বিশেষত্বহীন 'লিরিক অংশ কমাইয়া দিলে 'বৃত্রসংহারের' মহাকাব্যোচিত আকার কমিত কিন্তু গৌরব বাড়িত। পদলালিত্য প্রায়ই আছে। কিন্তু বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র সর্বত্র বাগ্‌যত নহেন। শব্দের প্রয়োগে ও সর্বত্র শোভন নয়। যেমন, 'দেবনাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে' ইত্যাদি। প্রথম সংস্করণে (প্রথম খণ্ড) শব্দপ্রয়োগে দোষ আরও অনেক ছিল, তাহা পরবর্তী সংস্করণে শোধরানো হইয়াছে। বৃত্রসংহারের

ভাষার প্রধান দোষ হইতেছে মধ্যে মধ্যে গদ্যবৎ ছত্রের ব্যবহার। যেমন—"স্বর্গের সমীপবর্তী পর্বতসমূহে", "কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।" "তুমি ত যুদ্ধ জান না" ইত্যাদি আরও উদাহরণ দেওয়া যায়।' কিন্তু আর উদাহরণের ভারাক্রান্তি না বাড়িয়েও বলা চলে যে, হেমচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যকে যথাযথ 'Poetic justice' ইত্যাদি দিতে সক্ষম হননি। তাই বিষয়গৌরবে, আকারে, প্রকারে মহাকাব্যোচিত হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে সার্থকতার তেমন সোপান অবতীর্ণ হয়নি 'বৃত্রসংহার'। তাই উনিশ শতকের বঙ্গীয় তথা ভারতীয় নবজাগরণের ফসল হলেও হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাসের ধারায় উল্লেখ্য হলেও শিল্পসার্থকতায় অনেকাংশেই হীনপ্রভ এবং এমনকি হেমচন্দ্রের কবি প্রতিভার বিচারেও ততোধিক আকর্ষণীয় নয়। তাই উনিশ শতকের মহাকাব্য রচনায় বাঙালি কবি হেমচন্দ্রের বাংলা কাব্য 'বৃত্রসংহার' প্রকৃত মহাকাব্য হিসেবে ব্যর্থ প্রয়াস বলেই বিবেচিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ যদিও এই কাব্যে ঘটেছে। সর্বশেষে কবি ব্লেকের ভাষায় বলা যায়—

'I must create a system are be enslav'd by another Man's.
I will not Reason and Compare; my business is to create.'

বাংলা রূপকথার গল্পভুবন

ছেলেভুলোনো গল্পই রূপকথা। রবিঠাকুরের কথায়—

না জানি কোন নদীর ধারে
না জানি কোন দেশে
কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।

দেশি বিদেশি নানা শিশুতোষিণী উপভোগ্য গল্প, ছড়া, কাহিনি, রূপকথার ঝুলি ভরে রেখেছে। বাংলায় রাক্ষস-খোক্কস, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, ভূতপেত্নী, খোকাখুকুর কাহিনি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ বরাবর রূপকথার কাহিনিকে ধরে রেখেছে। আজকের দিনের শিশুর শৈশব চুরি যায় কম্পিউটর গেম ও এই জাতীয় খেলায়। কিন্তু আজ থেকে কয়েক শতক আগেও ছেলেপুলেদের বুঁদ হয়ে থাকার উপকরণ ছিল ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলির মতো কাহিনিতেও—যার লেখক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পরবর্তীতে তাঁর সুপুত্র রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার।

পুরোনো দিনের রূপকথার কাহিনিকে কেন্দ্র করে শিশু-কিশোর কল্পনা পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়। ভারতীয় কাহিনিতে দশকুমার চরিত, বিদেশি ডেকামেরনের কথা মনে পড়ায়।

বিদেশি ঈশপের গল্পের কথাও আমরা কমবেশি জানি। যে-গল্পের আগের চেহারা ভারতবর্ষেই ছিল। আবার লুই ক্যারল-এর অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড উনিশ শতকে বঙ্গানুবাদে বাঙালিরা পড়ার চেষ্টা করেছিল এবং পরবর্তীতে এই জাতীয় অন্যান্য কাহিনিও অনূদিত হয়ে বা গল্পকাঠামো ধরে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। জার্মানির গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের লেখাও বিশ্ব আঙিনা পেরিয়ে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। রূপকথার সেই রাজকুমারীর জানালা দিয়ে বাড়ানো চুল বেয়ে রাজপুত্র তাকে উদ্ধার করেছে। কেউ কি আমরা ভুলে গেছি অরুণ-বরুণ কিরণমালার কাহিনি? আবার সিন্দোবাদ নাবিকের

গল্প আমাদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কেউ কি আমরা সহস্র এক আরব্য
রজনির কথা শুনিনি? রাজপুত্তুরের রূপোর কাঠি, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যা
উদ্ধারের কাহিনি আজও আমাদের মনশ্চক্ষে জীবন্ত হয়ে আছে। কেউ কি ভুলে
গেছি রাক্ষসের প্রাণভোমরা কোথায় লুকোনো আছে সেই কাহিনি? আজও আমাদের
সময়কে ছুঁয়ে যায় দুয়োরানি ও সুয়োরানির জীবনবৃত্তান্ত।

আবার ডাচ কাহিনিকার হান্স অ্যান্ডারসেন-এর কাহিনি পৃথিবীর নানা ভাষায়
বিবৃত হয়েছে। দেখা গেছে এই বাংলার উনিশ শতকে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'-এর
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'কুৎসিৎ হংসশাবক' ইত্যাদি অনুবাদ গল্পে বাঙালি শিশু
কিশোরদের মজিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আবিশ্ব রূপকথার রস পান করে
রূপকথার বর্ণ গন্ধে মৌজ করেছে। ভূত-পেত্নী-দত্যিদানোর গল্পে বাঙালির আশৈশব
আকৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভূতের গল্পে ব্রহ্মদত্যির কথাও আমরা জানি। আর
জানি তাদের কীর্তিকলাপের কাহিনি। এই আলোচনা সহজে শেষ হবার নয়। কারণ
এ যে—'শেষ হয়ে না হইল শেষ।' রয়ে যায় এর রেশ।

আজকের মতো আমাদের আলোচনায় আসবে গত শতকের অন্যতম সেরা শিশু
সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কিছু রচনা দিয়ে। বিখ্যাত শিশুপত্রিকা
'সন্দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। রূপকথার আদলে তাঁর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'
পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় কৃত চলচ্চিত্রের দৌলতে আপামর বাঙালি জানে।
উনিশ-বিশ শতকে দিগ্‌দর্শন, সখা, সাথী, মুকুল, শিশুসাথী, রামধনু, রংমশাল,
মৌচাক, অঞ্জলি, প্রকৃতি, ছোটোদের পাততাড়ি, শুকতারা, তেপান্তর, টগবগ ইত্যাদি
আরও অসংখ্য চাঁদমামার আকর্ষণে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। কুঁচবরণ কন্যার
মেঘবরণ চুলের মধ্যে জড়িয়ে আছে রূপকথার ইতিবৃত্ত।

দক্ষিণারঞ্জন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন নীলকমল-লালকমল, বুদ্ধুভুতুম,
কাঞ্চনমালাদের কথা? তাঁর নিজের কথায়—'মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা
শুনিতেছিলাম...মা'র মুখের অমৃত কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত। পরে কয়েকটি
পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে আবার যাহা শুনিতে শুনিতে শিশুর মতো হইতে হইয়াছিল।'
উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, আর বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ,
যেখানে তিনি লিখেছিলেন 'উহার উৎস বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ
দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে,
সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত
করিয়াছে। নিখিল বঙ্গের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা
উৎসারিত। অতএব বাঙালি ছেলে যখন রূপকথা শোনে—তখন কেবল যে গল্পই
শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ
চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া তোলে।'

অধ্যাপক ড. প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত গত আড়াই দশক যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, স্বশাসিত মহাবিদ্যালয়, বেলুড় মঠে অধ্যাপনা ছাড়াও সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত। বেশকিছু পত্রপত্রিকার লেখক। 'স্বনির্বাচিত প্রবন্ধাবলী', সম্পাদিত বই : 'বিশ্লেষণের আলোকে নাট্যকার মনোজ মিত্রের নাটক গল্প হেকিম সাহেব', বনফুলের ডানা-একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা, 'রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদে রবীন্দ্র কাব্যনাটক' তাঁর গবেষণা : 'Revisiting Learning the Treasure Within-On the Pathway of Vivekananda'।